

১৩তম কঠিন চীবর দান
স্মরণিকা
২০০৫ইং





কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Abhijnanada Bhante

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সুনন্দ স্ববির মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

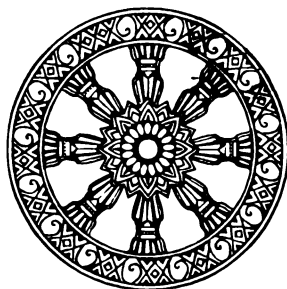


জন্ম ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। গৃহীর নাম তরনী মোহন চাকমা। পিতার নাম জানকধন চাকমা, মাতার নাম সাক্ষী চাকমা। বৈবাহিক সূত্রে একমাত্র পুত্র সুশীল কুমার চাকমা। গৃহী নিবাস তৎকালীন সুবলং খাগড়াছড়ি (বর্তমান মধ্যভিটা)। ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীতি হন এবং এক বৎসর পর উপসম্পদা গ্রহণ করেন বা ভিক্ষুত্ব লাভ করেন। দীপ্তরু প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ চিত্তানন্দ মহাস্থবির। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ রোজ সোমবার রাত ১১টায় সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি খুব দয়ালু, সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। তাঁর অবদানে আজকের এই আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার। তাই অত্র এলাকার দায়ক/দায়িকারা তাঁর অবদানের কথা চিরদিন স্মরণে

সংগ্রহেঃ

বিমলালঙ্কার ভিক্ষু

১৩তম কঠিন চীবর দান স্মরণিকা '০৫ইং আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার



প্রকাশনায়ঃ

আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ
জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

১৩তম কঠিন চীবর দান স্মরণিকা ২০০৫ইং
২৫৪৯ বুদ্ধাব্দ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদনায়ঃ

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু
রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি ।
বিমলাঙ্কর ভিক্ষু
আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার, জুরাছড়ি ।

সহযোগিতায়ঃ

শ্রীমাণ শীলযান শ্রামণ
কোঠন চাক্মা
ক্রিমিকান্তি চাক্মা
রতন মনি চাক্মা ।

প্রকাশ কালঃ

৭ই নভেম্বর ২০০৫ইং
২০ শে কার্তিক ১৪১২ বাংলা

প্রকাশনায়ঃ

আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ
জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

প্রচ্ছদঃ

দেশনালয় আমতলী বন ধর্মোদয় বন বিহার

কম্পিউটার কম্পোজঃ

শ্রীমৎ বিমলাঙ্কর ভিক্ষু
আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার
জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ।

আশীষ বাণী

বৌদ্ধ ধর্মীয় মহান উৎসব “দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান” উপলক্ষে আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারে ‘স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। যেহেতু ‘স্মরণিকা বা ধর্ম গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের দেশিত ধর্ম কথা, চতুরার্য্য সত্য কথা, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কথা, সদ্ধর্মের নীতি আদর্শ কথা, শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা কথা নিহিত থাকে। সেই ভগবান নির্দেশিত শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা তথা তার উপদেশ বাণী সমূহ যথাযথভাবে আচরণ অনুশীলন-প্রতিপালন-কর্ম-সম্পাদন-শ্রদ্ধা-গৌরব-বিশ্বাস করিলে, দীর্ঘকাল হিতসুখ সাধিত হয়, মঙ্গল সাধিত হয়, এবং যাবতীয় দুঃখ রাশি মোচন হয়। আর যদি বিপরীত পথে চলে, অন্যায় পথে চলে, ভুল পথে চলে, মিথ্যাদৃষ্টি পথে চলে, মিথ্যা ধারণা পোষন করে। বুদ্ধের উপদেশ সমূহ অনুশীলন, প্রতিপালন না করে, শ্রদ্ধা গৌরব-বিশ্বাস না করে, তাহলে দীর্ঘকাল দুঃখ অমঙ্গল সাধিত হয়, দুঃখরাশি পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, চতুর্বিধ বৌদ্ধ পরিষদের মধ্যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, যে আমার কথাগুলি উপদেশগুলি কর্ণপাত করিবে না, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করিবে না, সে অপায়ে গমন করিবে। অর্থাৎ চারি অপায় দুর্গতি ভূমি, তির্য্যক, প্রেত, অসুর, নরক। তাই বলা হইতেছে, প্রত্যেকেই বুদ্ধের কথাগুলি উপদেশগুলি বিশ্বাস করিতে হইবে, পালন করিতে হইবে। যাঁরা প্রকৃত কর্ম ও কর্ম ফলের প্রতি বিশ্বাসী, পরকাল বা পুনর্জন্ম বিশ্বাসী কর্ম ও কর্ম ফল সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে, ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে, তাঁরা সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি লোকেরা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে। তাঁরা কখনও দুষ্কৃতি কর্ম করিবে না, অধর্ম করিবে না, মন্দ কর্ম করিবে না। যেহেতু যে যেরূপ কর্ম করিবে, সে সেরূপ ফল ভোগ করিবে। সে নিজে দায়ী হইবে, বা অধিকারী হইবে। অন্য কেহ দায়ী বা অধিকারী হইবে না। তাই বলা হইয়াছে, সুখ-দুঃখ-উচ্চ-নীচ-দীন-দুঃখী-সত্ত্ব-অগনন-অন্ধ-কুণ্ঠ-বিকলাঙ্গ কর্মের কারণ। কর্ম সত্ত্বগণকে উচ্চ-নীচ না ভাবে বিভাগ করিয়া থাকে। দুষ্কৃতি কর্ম করিলে দুর্গতি, সুকৃতি কর্ম করিলে সুগতি, এই হলো কর্ম নিয়ম। কর্ম ফল থেকে কেহ নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং প্রতিটি কর্ম করিতে সাবধান হওয়া দরকার। যাহাতে দুষ্কর্ম করা না

হয় । সে দুষ্কর্ম কি? প্রাণী হত্যা, পঞ্চ বাণিজ্য, দশবিধ অকুশল কর্ম, পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম । যেমন- মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহত্ হত্যা, সংঘভেদ, বুদ্ধের দেহ থেকে রক্তপাত । যাহা দুষ্কর্ম তাহা অধর্ম । অধর্ম নরকে নিয়ে যায়, ধর্ম তথা সুগতি স্বর্গ লোকে প্রাপ্ত করায় । তদহেতু- তোমরা অধর্ম ত্যাগ কর, সত্য ধর্ম আচরণ কর, অনিবার্ণ কাল এটা হলো বুদ্ধ বাণী ।

সাধু-সাধু-সাধু

শ্রীমৎ বুদ্ধশ্রী স্থবির
অধ্যক্ষ
সুবলং শাখা বন বিহার,
জুরাছড়ি

সম্পাদকীয়

জুরাহড়ি উপজেলায় সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিহারের নাম আমতলী অমৃতদয় বৌদ্ধ বিহার। ১৯৮৫ সালে শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) এই বিহারে আগমন করেন। তখন তিনি এই বিহারের নাম পরিবর্তন করে রাখেন, আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার। এই বিহারের এক পাশ দিয়ে নিরন্তর ধারায় কল কল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে সুবলং (শলক) নদী। কাকের চোখের জলের মতো এই নদী। কেহই জানে না কখন কিভাবে উৎপন্ন হয়েছিল তার। কোন দিন বিশ্রাম করতে শুনিনি, দেখিনি তার স্তব্ধতা। সব মানুষ দিন দিন বদলে যাচ্ছে শুধু বদলায় না এই নদীর বহতা। কখনও বা করে বসে অনাকাজ্জিত ক্ষতি, আবার কখনও বা বয়ে আনে অনাবিল সুখ-শান্তি এবং সুফল। এখানকার মানুষেরা তার পরিবর্তনতা দেখতে দেখতে দিন যায় মাস যায় ঘুরে আসে বছর। আর এই বছর পরিক্রমায় আমাদের মাঝে হাজির হলো ২০০৫ইং পুণ্যবতী মহাউপাসিকার প্রবর্তিত নিয়মে দানোত্তম কঠিন চীবর দান। প্রতি বছর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাস শেষ হওয়ার পর পরই উদযাপন করা হয় এই দানোসৎসব। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বারও আমরা কঠিন চীবর দানোসৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারে উদযাপনের লক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের অনুষ্ঠানটি ঢেলে সাজানো হয়েছে তার মধ্যে এই ‘স্মরণিকাটি’ অন্যতম অংশ। কারণ এই প্রথম আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারে ‘স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ ৪০/৪৫ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্ন থেকে নানা বাধা-বিপত্তি ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করতে হয়েছে। তবু বিহার পরিচালনা কমিটির অসীম ধৈর্য ও অত্র এলাকার শ্রদ্ধাবান দায়ক/দায়িকাবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই বিহার আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তার পরও আমাদের পথ চলা এখানে শেষ নয় এখনও অনেক কিছু বাকী। তাই অত্র এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার কাছে সর্বাঙ্গিক সহযোগীতা দাবী রাখে। কয়েক যুগ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও প্রচার বিভাগহীন এবং শূন্য হাতে প্রকাশনার কাজ হাতে নেওয়া কত যে কষ্টকর তা একমাত্র ভুক্ত ভুগিরায় জানে। এই প্রকাশনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক মূল্যবান লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি। এই জন্য আমি

আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। যাদের লেখা বাদ পড়ে গেছে তারা হতাশ না হয়ে আরও দিগুন উৎসাহ নিয়ে শক্ত হাতে কলম ধরার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে করে ভবিষ্যতে সৃজনশীলতার ও মননশীলতার পরিচয় দিতে পারেন।

‘স্মরণিকা’ প্রকাশ করা শুধুমাত্র স্মরণীয় ঘটনা ধরে রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রেরণা হিসেবেও কাজ করবে। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বই হচ্ছে মানুষের একমাত্র সঙ্গী যার সাথে জীবনের কোন দিন মন-মালিন্য হয় না। এই ‘স্মরণিকা’ প্রকাশে সব চাইতে যার বেশী ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি তিনি হচ্ছেন অত্র বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমলালংকার ভিক্ষু। তিনি আমাকে সব সময় সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রকাশনায় যারা আর্থিক, কায়িক, বাচনিক, মানসিক ও লেখনী দিয়ে সাহায্য করেছেন আমি তাঁদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা ও মুদ্রণ জনিত কারণে প্রকাশনায় ভুল থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি গুলো নিজ অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ করে পড়ে নেওয়ার জন্য পাঠক মহলের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল। আমার প্রত্যাশা এই ক্ষুদ্র প্রকাশনাটির মাধ্যমে যদি পাঠক মহলের মনে যৎ সামান্য আনন্দ দিতে পারে তাহলে আমি মনে করি আমাদের পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা অন্তত কিছুটা হলেও সার্থক হয়েছে। পরিশেষে দানোত্তম কঠিন চীবর দান ২০০৫ ইং সর্ব জীবের জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনাময়ী জীবন। মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক দুনিয়াটা হোক প্রেমময় এবং শান্তির নীড় এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সাধু-সাধু-সাধু

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

মহামতি গৌতম বুদ্ধ বলেছেন-মানব জন্ম দুর্লভ। জন্মজন্মান্তরে সাধনা এবং পুণ্যের ফলে মানব জন্ম লাভ হয়। সুতরাং মানব জন্ম লাভ করে আমরা সবাই সুখী হতে চাই, সুখে থাকতে সবাই ভালোবাসে, আসলে প্রাণী মাত্রই সুখ বিলাষী। কিন্তু সুখের আশায় পৃথিবীর সকল প্রাণী তথা মানবগণ সুখের প্রলোভনে পড়ে দুঃখের অধিক মাত্র পেয়ে থাকে। সুখের জীবন গড়তে গিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মহা দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে কুল কিনারা সন্ধান পায় না। তাই অনন্তকাল ধরে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে অফুরন্ত দুঃখ ভোগ করতে করতে সংসার স্রোতে ভেসে চলে। যখন হঠাৎ করে কারো জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয় তখনই তিনি অপর জীবগণকে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। ‘ধম্মপদে বুদ্ধ বলেছেন- এসো, এই পৃথিবীতে শত্রু মিত্র ভেদাভেদ না করে আমরা সবাই মিলেমিশে শত্রুহীন হয়ে সুখে বাস করি। মানবগণের মধ্যে আমরা হিংসা ভাব ত্যাগ করে অহিংসা মনোভাব নিয়ে সুখে জীবন-যাপন করি। সকল তৃষ্ণা পরায়ণ লোভী জনগণের মধ্যে আমরা সবাই লোভ, তৃষ্ণা বর্জন করে এবং অজ্ঞানী জন সমাজের মাঝে আমরা জ্ঞানী হয়ে সুখে শান্তিতে অবস্থান করি। মানবগণ বিষয়াসক্ত ভোগ তৃষ্ণার জর্জরিত, তৃষ্ণায় নিমজ্জিত। সুতরাং বাইরে দিকে দৃষ্টিপাত না করে, সবাই যদি নিজের মনকে সংযত করতে পারে তবেই সকলে সুখ শান্তিতে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হবে। অতএব আসুন, আমরা সবাই হিংসাভাব পরিহার করে সর্ব জীবের প্রতি দয়াভাব প্রদর্শন করি। শত্রু মিত্রাদিসহ সমস্ত প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষন দ্বারা জীবনে সুখ শান্তি ও ভালোবাসা গড়ে তুলে নতুন একটা পৃথিবী সৃষ্টি করি।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব ২০০৫ইং উদযাপন করতে যাচ্ছি। অত্র বিহারের এটি হচ্ছে ১৩তম দানোত্তম কঠিন চীবর দান। এতে গ্রামাঞ্চল থেকে যে সকল শ্রদ্ধাবান দায়ক/দায়িকাদের আর্থিক, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সহযোগীতা ব্যতিরেকে বেইনঘর এবং অন্যান্য ঘর গুলো তৈয়ার করা আদৌ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। এ ছাড়াও যারা রাতভর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বেইন বুনন করেছেন এবং বেইন বুনন কাজের সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকর্মীদের

জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ । অনুষ্ঠানকে সুন্দর এবং সাফল্য মণ্ডিত করার লক্ষে যে সকল সহকর্মী সেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা কাজ করেছেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সকল সদস্যবৃন্দ, পূণ্যার্থী, দর্শনার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহল বা সদস্যবৃন্দকে জানাই সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা ।

সাধু-সাধু-সাধু

•

ভুবনানন্দ চাক্মা
সাধারণ সম্পাদক
আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার
পরিচালনা কমিটি ।

সভাপতির বক্তব্য

১৯৫৬ ইং সনে আমি তখন ছোট ছিলাম। বয়স আনুমানিক ৬/৭ বছর। সে সময় আমি খাগড়াছড়ি এম, ই স্কুলে ২য় শ্রেণীতে পড়তাম। তখন থেকে আমার জানা মতে স্বর্গীয় বাবু দূর্গাচরণ চাকমা ছিলেন খুবই ধার্মিক এবং উদ্যোগী ব্যক্তি। পারিবারিক জীবনে তিনি খাগড়াছড়ি এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং মহাজন হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৫৬ ইং সনে বিহার নির্মাণে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছেন স্বর্গীয় বাবু দূর্গাচরণ চাকমা (মহাজন)। তাঁহার সহপাঠি ছিলেন স্বর্গীয় বাবু বৃত্তান্ত মোহন চাকমা স্বর্গীয় বাবু জলন্ত মনি চাকমা স্বর্গীয় বাবু নারাজ চন্দ্র চাকমা। এই চার জনে বিহার নির্মাণের জন্য সকাল বিকাল পারিবারিক কাজ শেষে রাত্রি স্নান করার এক ঘন্টা আগে বিহারের মাটি কাটা কাজ শুরু করেন। এইভাবে প্রতি দিন কাজ করতে থাকেন। সপ্তাহখানিক পরে পার্শ্ববর্তী লোকেরা জানতে পারলেন বাবু বৃত্তান্ত মোহন চাকমার বাড়ির উত্তর পাশে ভিটায় বিহার নির্মাণের কাজ চলিতেছে। দিন দিন কাজের লোক বৃদ্ধি পেয়ে সহসা বিহারের কাজ সমাপ্ত হয়। তবে বিহারে ভিক্ষু বা শ্রামণ (থাকিতে হয় এবং দায়ক/দায়িকার ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়।) কিন্তু স্বর্গীয় বাবু দূর্গাচরণ চাকমা বিহার নির্মাণ উদ্যোগের আগে সুবলং মিটিঙ্গাছড়ি গ্রামে সামান্য একটি কুটিরে একজন বুড়ো শ্রামণ ছিলেন। তিনি 'দূমনস্যাং' নামে পরিচিত। শ্রামণের সাথে দেখা করে বিহার নির্মাণে সমস্ত কথা খুলে বলেন। পরিশেষে কথা দিয়েছেন বিহার নির্মাণ হইলে বুদ্ধমূর্তি মং, হংস, চান্ডি, ঘন্টিসহ যাবতীয় নিয়ে আসিব। এ কথা সহপাঠীদেরকে কাউকে প্রকাশ করেন নাই। পরবর্তীতে বিহার নির্মাণ শেষে সহপাঠি ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করে সুবলং মিটিঙ্গাছড়ি হইতে বুড়ো শ্রামণকে বিহারে ফাং বা আমন্ত্রন করে আনিলেন। কয়েকমাস পর বিহারটি উৎসর্গ করার জন্য রাঙ্গামাটি রাজ বিহারে শ্রদ্ধেয় অগ্রবংশ ভাস্কের সাথে সহপাঠীদের নিয়ে আলাপ শেষে শ্রদ্ধেয় ভাস্ককে আমন্ত্রন করা হয়। এবং শ্রদ্ধেয় ভাস্ক আমন্ত্রন গ্রহন করেন। সবাই বাড়ি ফিরে বিহার এলাকার গন্যমান্য মুকুন্ডসহ বিহার উৎসর্গ অনুষ্ঠান করার আলোচনা করে তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সেই সময় শীত কাল নির্দিষ্ট তারিখে ভিক্ষু সংঘ বিহারে এনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ ভাস্ক বিহারটি নাম রেখেছেন সুবলং খাগড়াছড়ি অমৃতোদয় বৌদ্ধ বিহার। তখন এই বিহারটি প্রথম স্থাপিত হলো খাগড়াছড়িতে। বিহার উন্ময়নের এলাকা

চকপতিঘাট মৌজা, বনযোগীছড়া মৌজা, এড়াইছড়ি মৌজা ও জুরাছড়ি মৌজা জনগণ প্রায় যোগদান করেন। ক্রমে বিহার উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। রাজগুরু অগ্রবংশ ভাস্কের কাছে একজন ভিক্ষুর জন্য প্রার্থনা করিলে তাহা পূরণ করেন। শ্রদ্ধেয় ভাস্কের নাম শ্রীমৎ চিত্তানন্দ ভিক্ষু। ১৯৫৮ইং ও ১৯৫৯ইং সনে বহি চক্র মেলা উদযাপন করা হয়। ১৯৬০ইং সনে কাণ্ডাই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়াতে বিহারটি আমতলী নামক স্থানে পুনঃ নির্মাণ করা হয়। তখন হইতে আমতলী অমৃতোদয় বৌদ্ধ বিহার নামে পরিচিত। ১৯৬৪ইং সনে শ্রদ্ধেয় চিত্তানন্দ ভাস্কের এই বিহার হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। কিছু দিন পর এক মার্মা শ্রামণকে রাখা হয়। এক বৎসর পরে তাঁকে ভিক্ষুত্ব করা হয়। এবং তাঁর নাম রাখা হয় উকোবিন্দু ভিক্ষু। তিনি প্রায় ১০/১১ বছর পর ১৯৭৫ইং সনে হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। বিহারে ভিক্ষু না থাকাতে পরিচালনার কমিটির সদস্যরা ভিক্ষু খুঁজতে খুঁজতে শ্রদ্ধেয় চিত্তানন্দ ভাস্কের কাচালং এক বিহারে হঠাৎ দেখা হলে তাঁকে আবারো আমতলী বিহারে অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় এবং তিনি সানন্দে রাজি হন। তিনি আমতলী বিহারে অধ্যক্ষ ও সভাপতি হিসাবে রাখা হয়। ১৯৭৭ইং সনে তৎকালীন অত্র বিহার বিহার পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয় বিহার অধ্যক্ষ সভাপতি হিসাবে থাকবেন বাকী সদস্যরা দায়কদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হয়। বিহার স্থাপিত হওয়ার পর প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিম চন্দ্র দেওয়ান। তিনি রাঙ্গামাটি চলে যাওয়াতে বনযোগীছড়ার বাবু সত্যেন্দ্রনাথ দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পর ১৯৭৩ইং সনে তাহারা বনযোগীছড়ায় একখানা নতুন বিহার নির্মাণ করেন। আমতলী বিহার হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হইয়া যান। তার পর স্বর্গীয় বাবু জলন্ত মনি চাক্মাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর পর কয়েক বৎসর বাদে তিনি ডায়াবেথিস রোগে মৃত্যু বরণ করেন। তার পর হতে বিহার পরিচালনায় দায়কের পক্ষ থেকে সভাপতি পদসহ কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় বাবু শান্তশীল দেওয়াকে এবং সহসভাপতি বাবু বৃত্তান্ত মোহন চাক্মা সাধারণ সম্পাদক বাবু জ্ঞান বিহারী চাক্মা। আর প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন করে সদস্য নেওয়া হয়। ১৯৮২ইং সনে বিহার অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ চিত্তানন্দ মহাথের। সে সময় এখানকার দায়ক বাবু জানকধন চাক্মার প্রথম পুত্র নাম তরণী মোহন চাক্মা আমতলী বৌদ্ধ বিহারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এক বছর পর শ্রামণকে উপসম্পদা দেওয়া হয়। তাঁর নাম

রাখা হয় শ্রীমৎ সুনন্দ ভিক্ষু। শ্রদ্ধেয় চিত্তানন্দ ভাস্তে তাঁর জন্ম স্থানে মানিকছড়িতে একটি নতুন বিহার নির্মাণের পর সেখানে চলিয়া যান। নব ভিক্ষু সুনন্দ ভাস্তেকে বিহার অধ্যক্ষ করা হয়। তাঁর সাথে আরো এক ভিক্ষু ছিলেন তাঁর নাম জ্ঞান প্রিয় ভিক্ষু। ১৯৮৫ইং সনে শ্রদ্ধেয় সুনন্দ ভাস্তে দেশনা প্রসঙ্গে প্রায় উপদেশ দিয়ে থাকেন শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের নীতি আদর্শের কথা। এবং বিশাখা কর্তৃক দানোত্তম কঠিন চীবর দানের কথা দায়কদের শুনাতেন। পরবর্তীতে সুনন্দ ভাস্তের আহ্বানে অত্র এলাকার শ্রদ্ধাবান দায়ক/দায়িকারা অনুপ্রাণিত হয়ে মধু পূর্ণিমায় এক আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের উপস্থিতিতে বিশাখা কর্তৃক প্রবর্তিত দানোত্তম কঠিন চীবর দান আমতলী বিহারে উদযাপন করা হবে। সে তারিখে সিদ্ধান্ত হয় প্রবারনা পূর্ণিমার আগে যাতে বেইনঘর হতে শুরু করে ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রবারনা পূর্ণিমা শেষে শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেকে ফাং করতে অত্র এলাকাবাসীরা রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহারে গমন করে। এবং শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেকে ফাং করা হইলে শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে ফাং গ্রহণ করেন। তারিখ অনুযায়ী শ্রদ্ধেয় ভাস্তেকে শিষ্যমণ্ডলীসহ রাঙ্গামাটি থেকে আমতলী বিহারে আনা হয়। যথারীতি পূণ্যবতী মহাউপাসিকা বিশাখার প্রবর্তিত নিয়মেই দানোত্তম কঠিন চীবর দান আরম্ভ হয় এবং দান পর্ব শেষে শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে দেশনা প্রসঙ্গে আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার নামে একটি বিহার স্থাপন করার জন্য উপদেশ দেন। সেই বিহারটি নির্মাণের জন্য প্রয়াত বাবু দয়াধন চাক্‌মা ৪০শতক জায়গা দান করেন। এবং উক্ত জায়গায় একটি বুদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা হয়। অনুরূপভাবে পর পর দুই বছর শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর উপস্থিতিতে বিশাখা কর্তৃক দানোত্তম কঠিন চীবর দান করা হয়। কয়েকমাস পর সুনন্দ ভাস্তে শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের শাসনে প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমতলী বিহার থেকে রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহারে একিবারে চলে যান। এর পর জ্ঞান প্রিয় ভাস্তেও অন্যত্র চলে যান। ১৯৮৭ইং সনে পরিচালনার কমিটি সভাপতি বাবু শান্তশীল দেওয়ান সপরিবারে রাঙ্গামাটি চলে যান। তবে সহসভাপতি প্রয়াত বাবু বৃত্তান্ত মোহন চাক্‌মা সভাপতিপদ গ্রহন করেন। কয়েক মাস বিহারে ভিক্ষু-শ্রামণ শূণ্য অবস্থায় থাকলে এক মার্মা শ্রামণ নিজে এসেছে আমতলী বিহারে অবস্থান করেন। তার নাম বিষয়ানন্দ শ্রামণ। তিনি কয়েক মাস থাকার পর উপদেশ দিলেন একটি বুদ্ধ আসন তৈরী করার জন্য। বলেন - আমি একজন ভালো মার্মা কারীগর আনিয়া দিব। প্রয়াত বাবু দূর্গা চরণ মহাজনের প্রথম পুত্র বাবু নিরোধ রঞ্জন চাক্‌মার উদ্যোগে যুবকরা শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করে বুদ্ধ আসনটি

আমার কিছু কথা

□ বছর শেষ হয়, আবার শুরু হয় নতুন করে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই কত পরিবর্তন আসে পৃথিবীতে, রাষ্ট্রে, সমাজে। চলে সৃষ্টি ও ধ্বংসের ধারাবাহিক কাহিনী। এর অনেক কিছুই আমরা জানি আবার অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। সাধারণের স্রোতে ভেসে চলা অগণিত মানুষের অসংখ্য হাসি কান্নায় খবর থেকে যায় আড়ালেই। তবুও চলে আমাদের জীবন। আর এই জীবন চলার পথে এবং সময়ের আবর্তে দৈনন্দিন কত কিছু সুখ-দুঃখের ঘটনা ঘটে যায় এবং জীবনকে প্রভাবিত করে তোলে। সে সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখলে হয়ে যায় এক ইতিহাস। সময় গড়িয়ে বছর ঘুরে এলো, উঁচু-নীচু সবুজ পাহাড় ঘেরা আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারে বয়ে নিয়ে এসেছে দানোত্তম কঠিন চীবর দানের শুভবার্তা।

গত বছরের ন্যায় এ বছরও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পুণ্যশীলা মহাউপাসিকা বিশাখার প্রবর্তিত নিয়মে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূটা কেটে বয়ন করে কঠিন চীবর দান। দানই হচ্ছে নির্বাণের যাত্রা পথের প্রথম সিঁড়ি। যত প্রকার দান আছে তন্মধ্যে কঠিন চীবর দানই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। তাই এই অনিত্যতা জগতের অন্ততপক্ষে কিছু দিনের জন্য হলেও এই মহান দানকে স্মৃতির এ্যালবামে ধরে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে ‘স্মরণিকার’ মাধ্যমে। তাই এই প্রথম আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারে ঐতিহ্যবাহী শুভ কঠিন চীবর দান উপলক্ষে ‘স্মরণিকা’ প্রকাশের জন্য বাবু কেতনসহ উদ্যোগী হলাম একজাঁক নবীন লেখক/লেখিকাদের নিয়ে। যে কোন বই লেখা কিংবা প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়, হোক না সেটি ক্ষুদ্র। এ ধরনের ‘স্মরণিকা’ প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের মোটেই পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তারপরও ‘স্মরণিকাটি যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য আমরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছি। মনে রাখতে হবে, আজ যাঁরা পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বনা মধণ্য বড় বড় সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক তাঁরাও এক দিন আপনার আমার মতোই ছিলেন। প্রতিভা একদিনে বিকশিত হয় না, মানুষের প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠে ক্রমে ক্রমে যথাযথ চর্চার মাধ্যমে। আজ রাষ্ট্রীয় শ্লোগান হচ্ছে -আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাই এখানে আমি বলবো -আজকের নবীন লেখক/লেখিকারাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। এর আগে এ ধরনের ‘স্মরণিকা’ জুরাছড়িতে কোন বিহারে কেউ প্রকাশ করেছেন কিনা এ মুহূর্তে আমরা জানা নেই। তার মানে এই নয় যে, এক মাত্র আমরাই প্রকাশ করতে পারি।

আমরা যতই (ধর্ম বিষয়ে) লেখালেখি করবো ততই আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে, এবং ধর্মকে আরো বেশি জানতে, বুঝতে সহজ হবে, সুযোগ হবে। এই জন্য চর্চার কোন বিকল্প নেই। তাই আমাদের এই প্রয়াস। বিশ্ববিখ্যাত স্বনামধন্য রুচিশীল পাঠক নন্দিত ডেল কার্নেগী কি বলেছেন,জীবন যাতে সুখের শান্তির সমৃদ্ধ হয় তারই জন্য বই পড়ে আপনি অনেক কিছু শিখবেন, এবং জ্ঞান বাড়বে। যত বেশী বই পড়বেন ততই জ্ঞান বাড়বে আপনার। অসংখ্য বই পড়ে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবেন। পৃথিবীটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় নয়। এখানে আমরা কেউ থেকে যেতে পারবো না। এটা একটা বড় দুঃখ আমাদের। তার পর ধরুন, আমরা যা চাই তা পাই না, পাবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করি কিন্তু অধিকাংশ চেষ্টায় সফল হয় না। সুখী হওয়ার, বড় হওয়ার, জনপ্রিয় হওয়ার উপায় সম্পর্কে যত বই-ই লেখা হউক না কেন, কোন বইতে (একমাত্র ধর্ম বই ছাড়া) নির্ঘাৎ সাফল্য নিশ্চয়তা নেই --দিতে পারে না!

অর্থাৎ জনপ্রিয় হতে চাইলেই আমরা হতে পারি না, বড় হতে চাইলেই হতে পারি না, সুখী হতে চাইলেই সুখী হতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানী হতে চাইলেই তা হতে পারি। জ্ঞানই একমাত্র জিনিস যা কেউ আপনার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আপনার জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার ভয় আছে, আপনি ধনী থেকে ফকির হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী থেকে মূর্খের পরিণত হতে পারেন না। পৃথিবীটা কি তা যদি জানতে পারেন, তাহলে এক দিন আপনাকে মরতে মনে করেও দুঃখ পাবেন না আপনি এবং পৃথিবীটা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে নিজেকে, আর নিজেকে বুঝতে, জানতে হলে একটা উপায়ে তা সম্ভব জ্ঞান অর্জন করুন। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পুঁজি কি? নিঃসন্দেহে জ্ঞানই হল সবচেয়ে বড় পুঁজি। জ্ঞানের সাধনা যাঁরা করে গেছেন তাঁদের কথা আমরা স্মরণ করি শ্রদ্ধাভরে কেন? তাঁরাই ছিলেন সত্যিকারের মানুষ। যে জ্ঞানী সে কিভাবে লাভবান হয়? মানুষকে ক্ষমা করতে পারে সে, মানুষকে সে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। একটু ভেবে দেখুন, তাহলেই কথাগুলোর সত্যতা অনুধাবন করতে পারবেন। জ্ঞান অর্জনে কোন খরচ লাগে না। চেষ্টা করলে, ইচ্ছা করলে এ জিনিস আপনি সঞ্চয় করতে পারেন অনায়াসে। বই-ই মানুষের জ্ঞানের প্রধান উৎস।

অন্যদিকে বুদ্ধ যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন তা শুধু পুস্তকে গোপন থাকলেই চলবে না, কিংবা ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পড়লে চলবে না। পক্ষান্তরে শিক্ষার সাথে ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে তার অনুশীলন

প্রয়োজন। কারণ অনুশীলন ব্যতীত কেউ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। অনুশীলনের জন্যই ধর্ম শিক্ষা করতে হবে সর্বোপরি একে উপলব্ধি করতে হবে। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারই চরম লক্ষ্য। এজন্যে জন্ম মৃত্যুর সংসার হতে উদ্ধারের ভেলার সহিত তুলনা করা হয়েছে। এই হেতু বৌদ্ধ ধর্মকে একান্তই দর্শন বলা চলে না কারণ ইহা কেবল জ্ঞান অন্বেষণে প্রণীত করার আগ্রহ নয়। বৌদ্ধ ধর্মকে দর্শনের সমীপবর্তী বলা চলে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যাপক। দর্শন প্রধানতঃ অনুশীলন বিহীন জ্ঞানলোচনা মাত্র পক্ষাঙ্করে বৌদ্ধ ধর্ম অনুশীলন ও উপরই বিশেষ জোর দিয়ে থাকে।

চাকমা বৌদ্ধদের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার অন্যতম মূল কারণ ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অশোভন আচরণ, আত্ম অহংকার ইত্যাদি। আমরা নিজেদের দিকে না তাকিয়ে অপরদের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত। ভালো কাজের প্রশংসাতো দূরের কথা, যিনি করছেন তাঁকে কিভাবে নিষ্ক্রিয় করা হবে, কুপোকাত করা যাবে, কলঙ্কের কালিমা লেপন করা যাবে তা নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকি। গৃহীদের মধ্যে এই প্রবনতা যেমন আছে, দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, কোন কোন ভিক্ষু-শ্রামণদের মধ্যেও এই প্রবনতা অনেক সময় দেখা যায়। পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা অনতিবিলম্বে পরিহার না করলে সমাজ যে কত দ্রুতগতিতে নিম্নাভিমুখী হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাগত বুদ্ধ বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য, দেশে দেশে, স্থানে স্থানে বিতরণ করে ধর্মের আলো ছড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। বহু জনের সুখতো দূরের কথা নিজের সুখের কথাও ভাবি না। মৃত্যুর পর কোথায় যাব সে চিন্তা যেন ভুলে গেছি। আমাদের চিন্তা চেতনা কেবল ভাল ভাল খানা খাওয়া, ভাল কাপড় পড়া, দামি দামি প্রসাধনী ব্যবহার করা, ভালভাবে থাকা আর টাকা পয়সা সঞ্চয় করা। মন অহরহ কেবল পেতে চাই, এ চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ নেই। ভোগে মোটেই তৃষ্ণা মিঠে না। তৃষ্ণা যেন আমাদেরকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। বুদ্ধের বাণী তৃষ্ণাই সর্ব দুঃখের মূল। এ বাক্য আজ ত্রিপিটকের পাতায় পাতায়। অতীত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করার জন্য এমন আচরণ হওয়ার কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে দুর্লভ কি? কি অর্থে দুর্লভ এবং কেন দুর্লভ মানব জন্ম বলা হয়েছে তাও বুঝি না এবং বুঝার চেষ্টাও করি না। এ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে বৃথা হারালে আবার কখন মনুষ্য জন্ম পাওয়া যাবে সে আশা দুরাশা। অতএব মানব জন্ম কেন দুর্লভ এটা আমাদের বুঝা উচিত যা আমরা গুরুত্ব দিই না।

বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত

হয়। আমরা বৌদ্ধরা এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন মিথ্যা দৃষ্টির অন্ধ জালে আবদ্ধ হয়ে আছি। বর্তমান সময়ে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে শুদ্ধ ধর্মকে নাদ দিয়ে আমরা এখন ছাল বাকলকে ধর্ম বলে মানতে শুরু করে দিয়েছি এবং ধর্মকে বাণিজ্যিকরূপে ব্যবহার করছি। তাই শুদ্ধ ধর্ম আমাদের কাছে একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে। ধর্মের শুদ্ধতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এই জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেও প্রকৃত ধর্মের ফল আমরা পাচ্ছি না। ধর্ম ধর্মের জায়গা ঠিকই রয়েছে। ধর্মের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেও এর ফল না পাওয়া এগুলো আমাদের শুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং মূঢ়তার বিষময় ফল। বুদ্ধের জীবদ্দশায় শ্রেষ্ঠী পুত্র বক্কুলী স্থবির প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর সর্বদা অশীতি ব্যঞ্জন লক্ষণ গুণে বিমন্ডিত মহাকারণিক বুদ্ধের একান্ত কাছাকাছি থাকতেন এবং সর্বদা বুদ্ধ রূপই দর্শন করতেন। একদা বক্কুলী স্থবিরকে বুদ্ধ বলেছিলেন, যেবা যারা বুদ্ধ রূপ দর্শন করে, বিভিন্ন ধূপ-ধুনা দিয়ে আহালাদি দিয়ে বুদ্ধ পূজা করে কিন্তু বুদ্ধের আবিষ্কৃত মার্গ অনুসরণ বা আচরণ করে না, তারা একান্ত নিকটে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তথাগতের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। আর হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করেও বুদ্ধ দেশিত নীতি আদর্শ মেনে চলে এবং অনুসরণ করে তাতে তারা তথাগতের একান্ত নিকটেই অবস্থান করে থাকে। এই দৃষ্টান্ত থেকেই বুঝে নেওয়া উচিত বর্তমান যে পরিস্থিতি চাক্কা বৌদ্ধ সমাজে চলছে তাতে প্রকৃত বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম বিনয় থেকে আমরা কত কাছে বা দূরে অবস্থান করছি।

সাধু-সাধু-সাধু।

ইতি/

শ্রীমৎ বিমলালঙ্কার ভিক্ষু
আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার।

আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারের শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমলালঙ্কার ভিক্ষু মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

- ১। ভিক্ষু নাম : শ্রীমৎ বিমলালঙ্কার ভিক্ষু
- ২। পিতা : বাবু কর্ণধার চাক্‌মা
- ৩। মাতা : মিসেস্ মদনদেবী চাক্‌মা
- ৪। জন্ম : ১৯৮০ ইংরেজী
- ৫। গৃহীর নাম : বিমল চাক্‌মা
- ৬। গৃহী নিবাস : ডানে পানছড়ি, জুরাছড়ি
- ৭। প্রব্রজ্যা : ১৯৯৫ ইংরেজী
- ৮। দীক্ষা গুরু : প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সুনন্দ স্থবির
- ৯। উপসম্পদা : ২০শে মার্চ ২০০০ সাল, সোমবার ২৫৪৩ বুদ্ধাব্দ।
- ১০। উপাধ্যায় গুরু : শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে)
- ১১। উদকসীমা : ধর্মপুর আর্য বন বিহার, খাগড়াছড়ি।

বর্ষাবাস

- ১ম আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার, জুরাছড়ি।
- ২য় আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার, জুরাছড়ি।
- ৩য় আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার, জুরাছড়ি।
- ৪র্থ আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার, জুরাছড়ি।
- ৫ম আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার, জুরাছড়ি।
- ৬ষ্ঠ আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার, জুরাছড়ি।

সংগ্রাহেঃ
বিন্দু চাক্‌মা
চকপতিঘাট

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাধনার অন্তরায়- রেবত প্রিয় ভিক্ষু.....	০১
বনভাস্তের চক্ষু অপারেশনের একটি মুহূর্ত- করুণাময় ভিক্ষু.....	০৫
কাল ও জীবন- বিমলালঙ্কার ভিক্ষু.....	০৭
আত্ম নির্ভর শীল হও- স্মৃতিযোগ শ্রামণ.....	১৩
কর্ম ও কর্ম ফলের বিশ্বাস- হৃদয়ানন্দ চাক্‌মা (রাঙ্গা)	১৮
প্রসঙ্গঃ বৌদ্ধ ধর্ম- টিটো চাক্‌মা.....	২০
বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী- নীতিভুবন চাক্‌মা.....	২২
কঠিন চীবর দানের ফল- মিস্‌ সীমা চাক্‌মা	২৬
বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ- সংগ্রহে-মিস্‌ অর্পি চাক্‌মা ।	২৭
ত্রিশরণ- সুবলবসু চাক্‌মা	২৯
আমরা কি বৌদ্ধজাতি?- বিন্দু চাক্‌মা	৩২
জীবনের সার্থকতা- তরুন জ্যোতি চাক্‌মা	৩৪
মানব সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা- মিস্‌ বাবলী চাক্‌মা.....	৩৫
আমার মহাকাল থেকে রক্ষা কবচ শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে- মিসেস্‌ রাজুলতা চাক্‌মা	৩৭
ধর্মের প্রতি আমার যেটুকু মূল্যায়ন- মিস্‌ রূপালী চাক্‌মা	৪১
জন্ম মৃত্যু রহস্য- মিস্‌ বিশাখা	৪৩
অভাগী সোহাগ- মিস্‌ মনোনিতা চাক্‌মা	৪৫
কঠিন চীবর দান- সংগ্রহে-মিসেস্‌ চারুবালা চাক্‌মা	৪৮

কবিতা

ওগো ত্যাগী বনভাস্তে- প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু	৫১
প্রভাতী আহ্বান- সুবর্ণ ভিক্ষু.....	৫২
কাজই ধর্ম- সুদর্শন শ্রামণ	৫৩
হে বনভাস্তে প্রণাম লও- মৈত্রীসেন শ্রামণ	৫৩
ক্ষমা করো মোরে- শীলয়াল শ্রামণ	৫৪
ছোঁয়াও আলোর পরশ- শ্যামল তালুকদার	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবহেলা পঞ্চশীল- বিবেকানন্দ চাক্মা.....	৫৬
আহ্বান- নির্মলকান্তি চাক্মা	৫৬
চল সব- মিস্ হিনিক্কা চাক্মা	৫৭
প্রিয় কঠিন চীবর- মিস্ জোসিনা চাক্মা	৫৮
হে জ্ঞানী- মিস্ রিতা চাক্মা	৫৯
মহা কঠিন চীবর দান- বিন্দু চাক্মা	৫৯
রাজবন বিহার- মিস্ সংগীতা চাক্মা	৬০
মহাকঠিন চীবর দান- মিস্ রুমি চাক্মা	৬১
রাজবন বিহার- মিস্ ইভা চাক্মা	৬১
আমাদের পণ- মিস্ কলি চাক্মা	৬২
বন বিহার- মিস্ এবিকা চাক্মা	৬২
খুশী মনের প্রার্থনা- মিস্ পারিকা চাক্মা	৬৩
আশীর্বাদ- মিস্ জিতি চাক্মা	৬৪
জ্ঞানের পূজারী বনভাঙে- মিসেস্ সেবিকা চাক্মা	৬৪
তৃষ্ণা- মিস্ সরঙ্গীনি চট্টোপধ্যায় (তন্দ্রা)	৬৫
দুঃখ মুক্তি ও মহান আর্ষশ্রাবক বুদ্ধ- মিস্ সুজিতা চাক্মা (শীলা) ..	৬৬
দানোদ্রীয় সর্বজ্ঞা কঠিন চীবর দান- মিস্ উর্মি চাক্মা (টুনটুনি)	৬৬
ধর্মীয় গান- শ্রীমৎ জ্ঞানদীপ ভিক্ষু	৬৭
ধর্মীয় গান- শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবোধি ভিক্ষু	৬৮
ধর্মীয় গান- শ্রীমাণ ধর্মরক্ষিত শ্রামণ	৬৯
আমতলী বিহার স্মরণে- মিস্ সুচরিতা চাক্মা	৬৯
গাই গাই মুক্তি অ-না- প্রসেনজিৎ চাক্মা	৭০
যেই বেগে বনভাঙে সিদু- গুরিমিলা চাক্মা (দুলাল মা)	৭০
বর মাগৎ- মিস্ সন্ধিতা চাক্মা	৭১
ত্যাগী বনভাঙে- মিস্ রূপনা চাক্মা	৭২
বর মাগঙর- চন্দ্রবসু চাক্মা	৭২
অরহত পূজনীয় বনভাঙে- মিস্ মনিষা চাক্মা	৭৩
চাক্মা কথায় ফুল পূজা- সংগ্রহে মিস্ রমা চাক্মা	৭৪

সাধনার অন্তরায়

শ্রীমৎ রেবতপ্রিয় ভিক্ষু

সুবলং শাখা বন বিহার, জুরাছড়ি

সাধারণতঃ অন্তরায় বলতে বাঁধা, বিপত্তি, বিঘ্ন, আচ্ছাদন, আবরণ, নিবারণ, ঢাকনি, প্রতিবন্ধক, ও প্রতিপক্ষ বুঝায়। স্বর্গ-মোক্ষের পথ আচ্ছাদন করে রাখে, উন্নতি লাভের ব্যাঘাট ঘটায়, জীবন বিশুদ্ধি লাভে বাঁধা জন্মায়। বিবাদ-বিরোধ বিধ্বংসনে বিপত্তির সৃষ্টি করে এসব অর্থে অন্তরায়। মানুষের জীবনে এমন সব অন্তরায়কর ধর্ম অতীত ও বর্তমান জীবনের অকুশল কর্ম বিপাক ও অকুশল কর্মরূপে বিদ্যমান থাকে যা উচ্চাবিলাষ সিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক। সেই অকুশল, কর্ম জনিত প্রতিবন্ধকই আবরণ বা অন্তরায়। এ অন্তরায়কর ধর্ম পাঁচ প্রকার। যথাঃ-কর্মান্তরায়, ক্রেশান্তরায়, বিপাকান্তরায়, উপবাদান্তরায়, ও আজ্ঞা-অমাণ্যান্তরায়। এখানে ক্রেশান্তরায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণতঃ ক্রেশ অন্তরায় ত্রিবিধ। যথাঃ-অহেতুক-দৃষ্টি, অক্রিয়া-দৃষ্টি, ও নাস্তিক-দৃষ্টি। মানুষ মনে করে-এ জগতে স্থাবর জঙ্গম যত সম্পদ, যত জীবিত সত্ত্বা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টির মূলে কোন হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। কোন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তিতে সর্ব প্রকার পদার্থের সৃষ্টি ও বিলয় হয়ে থাকে। জাগতিক সব কিছু হেতু প্রত্যয় বিহীন-এরূপ ধারণাকে অহেতুক দৃষ্টি বলে। একশ্রেণীর মানুষ মনে করে এই জগতে দান-শীল ভাবনা বলে কোন রূপ কুশল কর্ম কিংবা প্রাণী-হিংসা, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যা, নেশাপান বলে কোনরূপ অকুশল কর্ম নাই। কুশলাকুশল কর্মের ফল কিছু নাই। যা করা হয় তা' করার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। সংক্ষেপে কর্ম ও ফলে অবিশ্বাস সূচক ধারণাকে অক্রিয়া-দৃষ্টি বলে। আবার এরূপ একশ্রেণীর লোক মনে করে-অতীত জন্মের কোন কর্মের ফল বর্তমান জন্মে সংক্রমিত হয় না অথবা ইহজন্মে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করা হলেও ইহজীবনে বা ভবিষ্যত জীবনে উহাদের কোনরূপ পাক প্রতিফলিত হবে না। অর্থাৎ অতীতে-অনাগত জন্মের প্রতি অবিশ্বাস মূলত ধারণাকে নাস্তিক-দৃষ্টি বলে। অহেতুক, অক্রিয়া ও নাস্তিক এই ত্রিবিধ-দৃষ্টি মানুষের জীবনে অন্তরায়কর ধর্মরূপে পরিগণিত উহাদের মূল উপাদান হচ্ছে দশবিধ ক্রেশ। যেমনঃ লোভ, দ্বেষ,

মোহ, মান, দৃষ্টি, সন্দেহ, আলস্য, অবসাদ, ঔদ্ধত্য ও কৌকৃত্য। শুধু পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টি এই ক্লেশ সমূহ হতে উৎপন্ন হয় বলে উল্লেখ হয়েছে। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার অকুশল কর্ম, অকুশল কর্মজনিত যত অন্তরায়, যত অঘটন সব কিছুর মূলে রয়েছে এই ক্লেশ সমূহ। কোনরূপ ক্লেশ বা মানসিক বিকার ব্যতীত কোন অন্তরায় কর্ম কিংবা অকুশল কর্ম সম্পাদিত হতে পারে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্লেশের অর্থ, লক্ষণ, স্বভাব ও কৃত্য সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। (১) লোভ-লিঙ্গা, আসক্তি, কামনা-বাসনা, তৃষ্ণা, পিপাসা, রাগ অবিদ্যা ইত্যাদি অর্থে লোভ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা চরিত্র বৃত্তি বা মনোবিকার। এই মনোবিকারের শিকার হয়ে মানুষ মান কর্ম, বাক্য কর্ম ও কায়কর্ম সম্পাদন করে। প্রাণীগণকে দুঃখ সাগরে পরিচালনা করা ইহার কাজ। উপভোগে লোভের নিবৃত্তি হয় না, ইহা অতৃপ্ত বাসনা। এজন্য সূত্র পিটকের এই লোভ মনো-বৃত্তিক সহস্র বাহু বলে বর্ণনা করেছেন। এই লোভই মানুষকে পর সম্পত্তিতে, পর রাজ্যে প্রলুব্ধ করে এবং জাগতিক বিষয় বস্তুতে রঞ্জিত করে রাখে। কি মানুষ, কি ইতর প্রাণী সকলের মধ্যে এই লোভের তাড়না সমতুল্য। কুশল শক্তির প্রভাবে মানুষ ইহাকে সীমিত সংযমিত করে রাখে। ইতর প্রাণী তা পারে না। ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাতত দৃষ্টিতে হিংসাত্মক হলেও মূলত লোভ চরিতার্থ তার অভাবেই এইসব ঘটে থাকে। আকাজ্জ্বায় বাধা পড়লেই হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। (২) দ্বেষ হিংসা বিদ্বেষ ক্রোধ, প্রচণ্ডতা, প্রতিঘ, ব্যাপাদ ইত্যাদি অর্থে দ্বেষ মনোবৃত্তি। অপরকে হনন করে বলে প্রতিঘ। অপরের হিত সুখের বিপদ কামনা করে ব্যাপাদ ক্রোধ বা প্রচণ্ডতা ইহার লক্ষণ। ইহা বিষধর সর্প হতেও ভীষণতর। অশনি নিপাততুল্য দ্রুত' বিসর্পন স্বভাব। অর্ন্তদাহে দাবাগ্নি সদৃশ। আত্ম হিত সাধনে শত্রু সম সর্বস্ব অহিত সাধনে পুতিমূত্রবৎ। মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অর্হত হত্যা, দ্বেষ চিন্তে বুদ্ধ দেহ হতে রক্তপাত, সংঘর্ষে প্রভৃতি কর্ম দ্বেষ চিন্তার কারণে। কেহ আমার অনিষ্ট করলে আমার প্রিয়বস্তু কিংবা প্রিয়জনের অনিষ্ট সাধন করলে অথবা অপ্রিয় জনের উপকার করলে দ্বেষের সৃষ্টি হয়। লোভের কাজ হল বিষয়কে গ্রহণ করা, ভোগ করা, পরিত্যাগ না করা, আর দ্বেষের কাজ হল বিষয়কে দূর করা, নস্যাৎ করা, ধ্বংস করা, এই মনোবৃত্তিই দেবদত্তকে বুদ্ধ হত্যার নিযুক্ত করেছিল। এবং অঙ্গুলিমালকে নরঘাটক দুষ্ট্য করেছিল। মোহ প্রাণীগণকে

মোহিত করে বলে মোহ বা অজ্ঞানতা, অবিদ্যা মিথ্যা জ্ঞান, কুপ্রজ্ঞা অন্ধকারের সঙ্গে তুলনীয়। অন্ধকার যেমন বস্তু নিচয়কে ঢেকে রাখে, চক্ষুর দৃষ্টি শক্তিকে ব্যর্থ করে দেয় তেমনি মোহ বিষয় বস্তুর যথার্থ স্বভাবকে ঢেকে রাখে, চিন্তের কল্যাণে ও সম্যক দৃষ্টিকে ব্যর্থ করে দেয় ও চিন্তের অন্ধতা সৃষ্টি করে। জীবন ও জগতের স্বাভাবিক ধর্ম যে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম, তা আচ্ছাদন করে রাখা মোহের কাজ। মোহ সর্ব প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের মূল ও সর্ব দুর্নীতি কারণ। লোভ-দ্বেষ্টাদি মূলক সকল অকুশল মনোবৃত্তির মূল কারণ ও এই মোহ। কুশল কর্ম সম্পাদনে এই মোহ শক্তিহীন অন্ধ বটে; কিন্তু পাপকর্ম সম্পাদনের জন্য নানা উপায় নির্ধারণে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। আনবিক বোমা নির্মাণ, নিপুণ তাৎপর্য্য-পূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার, চুরি ডাকাতির বিচিত্র কৌশল, ব্যাভিচারের দূরভিসন্ধি-সব মোহের প্রভাবে সংঘটিত। মান-আমিভুবোধ, অভিমান, অহংকার, আশ্ফালন, দম্ভ, গোড়ামি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। অন্যে সাথে তুলনা করা মানের লক্ষণ। অন্যের সৌন্দর্য্য, কালীণ্য, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যামত্তা, ধর্মজ্ঞান, চরিত্র, ধন-দৌলত, জায়গা জমি ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজকে তুলনা করে শ্রেষ্ঠ সমকক্ষ ও হীন মনে করে বলেই মনে অভিমান। শ্রেষ্ঠ মনে করার মধ্যে যেমন অহংকার-বোধ থাকে তেমনি থাকে সমকক্ষ ও হীন মনে করার মধ্যে। এজন্য তৃষ্ণা, দৃষ্টি, ত্রিবিধাকারেই মানুষের অহঙ্কার প্রকাশিত হয়। তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান এই মনোবৃত্তি ত্রয় লোভ মূলক চিন্তেই উৎপন্ন হয়। মান মনোবৃত্তিই অন্তর মূলে থেকে জগতে যত বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ-বিগ্রহ সৃষ্টি করে। দাসানুদাস মূর্খ, পাগল সর্বত্র পরাজিত হয়েও উদ্ধত হয়ে থাকে। এরূপ হতভাগ্যগণও যদি মানের মধ্যে গণ্য হয় তবে দীন হীন কাকে বলব? বস্তুতঃ মান মনোবৃত্তির আবার একটা কুশল দিক আছে। মান শত্রুকে জয় করার জন্য কাপুরুষতা ধ্বংস করে। মহদাকাজ্ঞা সিদ্ধ করার জন্য অন্তরের দৃঢ়তা জ্ঞাপক যে অনুরাগ বা মান-তা উর্দ্ধগামী সংযোজন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মান শত্রুকে নিহত করার আদর্শে যে মনোভাব বহণ করে সেই প্রকৃত মানী। এরূপ মান অন্তরে সর্বদা পোষণ করা কর্তব্য। সন্দেহ-চিন্তের সংশয় দ্বি-মতি। এরূপ না সেরূপ, হ্যাঁ বা না এর সন্দেহ দোলায় চিত্ত যখন ঘড়ির দোলকের ন্যায় দুলতে থাকে তখনই সন্দেহের অবস্থা সৃষ্টি হয়। কোন বিষয় স্থির সিদ্ধান্তের অভাব কিংবা অক্ষমতা হেতু চিন্তের অস্থিরতাই সন্দেহের লক্ষণ। ইহাতে পরিণামে অস্থিরতায় সূচিত হয়। নানা বিষয়ে অনবরত চিন্তকে ঘুরান সন্দেহের কাজ। সন্দেহ চিত্ত আপন জনকে পর করে, পরকে শত্রু করে। সর্বদা ভয়-ভীতি

আনায়ন করে। চিত্তের একাগ্রতা আসতে দেয় না। সন্দেহের দোসর হল-
 অবিশ্বাস। অবিশ্বাস সর্বদা মোহ মৌলিক মনোবৃত্তি। শত্রুতা সৃষ্টির পক্ষে
 সন্দেহ বড় ভীষণ মনোভাব। স্ত্যানমিদ্ধ- এই মনোবৃত্তি দু'টি আলস্য।
 অবসাদ, সঙ্কোচশীলতা অনুৎসাহ, অস্পষ্টতা, তন্দ্রা, বিজৃম্বা (হাই তোলা),
 লীনভাব, অকর্মণ্যতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। চিত্তের উৎসাহ, উদ্যম
 পরাক্রম নষ্ট করা ইহাদের কাজ। স্ত্যানমিদ্ধ কুশল কর্মের পরিকল্পনা গ্রহণে
 রোগ-দুর্বল ব্যক্তি ন্যায় শুধু হীন নহে, অনিচ্ছুক। এই উভয় মনোবৃত্তিকে
 লক্ষণ কাজ ও প্রতিপক্ষ একই প্রকার বলে “পঞ্চ নীবরণে” এক নবীন রূপে
 গ্রহণ করা হয়েছে। মনে হয় স্ত্যানমিদ্ধ মানুষের জীবনে এত দোষণীয় নহে।
 বস্তুতঃ তা নহে। স্ত্যানমিদ্ধ অত্যধিক মারাত্মক ব্যাধি, যে ব্যাধির আর উপশম
 নাই। অপরাধ করলে অপরাধের ক্ষমা আছে, পাপ করলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত
 হয়, কিন্তু আলস্য (আমাদের) অসাদের ক্ষমা নাই। প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অলস
 ব্যক্তিকে আলস্যের দুর্ভোগ ভোগ করতেই হবে। আলস্য মানুষের জীবনে
 অখণ্ডনীয় অপরাধ। উদ্ধত্য-উগ্রতা, অশান্ত, অশিষ্টতা, রুক্ষতা ইত্যাদি অর্থে
 ব্যবহৃত হয়। যে বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করে উদ্ধত্য উৎপন্ন হয় তার উপর
 চিত্তের উৎক্ষেপন অশান্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি-হয় তাতেই ঔদ্ধত্যের প্রকাশ
 ঘটে। ভস্মরাশিতে দগুঘাত করলে যেমন ভস্মরাশি আকাশে উড়তে থাকে,
 তেমনি উগ্র মেজাজী যখন তার বিষয় বস্তুর উপর ক্ষেপে যায় তখন চিত্তের
 পুনঃ পুনঃ লাফালাফির সাথে নিজেও লাফালাফি আরম্ভ করে। চোখে মুখে
 আগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তখন উগ্র মেজাজী লোকটির কিছু করে ফেলে, সে
 নিজেও জানে না।

সাধু-সাধু-সাধু

“বনভান্তের চক্ষু অপারেশনের একটি মুহূর্ত”

শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

পৃথিবীর মানচিত্রের বুকে সুন্দর পাহাড় ঘেরা সবুজ বনানী চারিদিকে পানির নৈসর্গিক দৃশ্যের সমারোহে সমাহিত বাংলাদেশের অবস্থিত অপরাধ শোভা বর্ধন মন কেড়ে নেওয়া স্বর্গপুরী রাঙ্গামাটি শহর। দূর থেকেই দেখা যায় অনন্ত আকাশের বুকে বলমলে পূর্ণিমার চাঁদ। কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না ঠিক তেমনি দূর থেকে সকলে জানে রাঙ্গামাটি শহরে রাজবন বিহারে সকল প্রাণীর মৈত্রীপরায়ণ কল্যানমিত্র শান্তির দায়ক অলৌকিক শক্তির অধিকারী মুক্ত পুরুষ ষড়ভিজ্ঞা অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তের কথা। যার নামে সবাই শ্রদ্ধায় নতশিরে আনন্দে আপনুত। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে- *As You Sow So You Reap* অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। মানুষ আপন গতিতে চলতে গিয়ে কুশল ও অকুশল এদুটো কর্মের শিকার হয়। কর্ম ছাড়া মানব জীবন এক মুহূর্ত ও চলে না। প্রতি সেকেণ্ডের পলে পলে কর্ম প্রবাহ ঝর্ণার স্রোতের ধারার মত বয়ে যাচ্ছে জীবনের সন্নিগটে। যত দিন পর্যন্ত অনুপাদিশেষ নির্বাণে উপনীত হওয়া যায় না তত দিন পর্যন্ত জগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে থাকিয়া কর্ম নামক বন্ধু রূপী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। চারি অসংখ্য কল্প পূর্ণ পারমী জগত জ্যোতি বুদ্ধ পর্যন্ত ছাড়তে পারেননি অতীতের বারটি অকুশল কর্মের বিপাক। কর্মের কাছে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন সর্বজ্ঞ বোধিজ্ঞান লাভ করার পরই। ঠিক তদ্রূপ হয়ত অতীত অতীত অকুশল কর্মের বিপাকের ফলে আজই পুণ্য পুরুষ বনভান্তের চক্ষু অপারেশন করতে সম্মুখীন হয়েছেন। বনভান্তের আদর্শের গড়ে ওঠা তাঁর শত শত শিষ্য মণ্ডলী অন্যান্য শাখা বন বিহার থেকে এসে কানায় কানায় ভরে উঠলো রাজবন বিহার ক্যাম্পাস প্রাঙ্গন। অপারেশনের দিনটি ছিল ২০০৪ সালে ৩০শে নভেম্বর রোজ মঙ্গল বার। আর আমি নিত্য দিনের মত কাক ডাকা ভোরের সময় বিছানা থেকে উঠে পড়ি। হাত মুখ ধোয়ার পর মৈত্রী ভাবনায় রত হই যাতে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের অপারেশন সৃষ্টি হয়। ভাবনা শেষে এগুতে থাকি শ্রদ্ধেয় বনভান্তের বাস ভবনের দিকে তাঁর পবিত্র পদতলে বন্দনা করার জন্য। তখন আকাশের পূর্ব প্রান্তে আলোয় রেখা ফুটে উঠেছে, এতে অন্ধকার হালকা হয়ে এসেছে। আপন মনে ধীরে ধীরে, দলে দলে আসতে লাগলো শ্রদ্ধেয় বনভান্তের ভক্ত উপাসক/উপাসিকা পরিষদ বৃন্দ। সকাল বেলা নিত্য দিনের মত নেই শত শত গানের গাওয়া

লাফালাফি আনন্দের খেলা। তারাও গাছের ঝোপের আঁড়ালে চুপ করে বসে থেকে চেয়ে আছে একাকী পবিত্র মন নিয়ে শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের সুন্দর দোতলা বাস ভবনের দিকে। সময় যতই অতিবাহিত হতে লাগলো ততই ভিক্ষু শ্রামণ, উপাসক-উপাসিকার ভিড় জমালো। সময় গড়িয়ে এক সময় বিদেশী ডাক্তার বাবু তার সহকারী পরিষদ নিয়ে এসে পড়লো গাড়িযোগে। সারাক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করতে দেখা গেল শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের একান্ত উপাসক ববি ও অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৃতি বাবুকে। সকাল নয়টার দিকে শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেকে সাধুবাদের সহিত বন্দনা জানিয়ে অপারেশন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সাথে ছিলেন শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের প্রিয় সেবক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র স্ববির ও শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্ববির। বিহারের চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বনরাশি যেন পাতায় পাতায় সূর্যের কিরণ ঝিকিমিকি করছিল। দূরের আকাশের প্রান্তে শরতের শুভ্র মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছিল। ঠিক তখন শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের চক্ষু অপারেশন শুরু হলো। আর আমি এক বুক আশাহত নিঃশ্ব বেদনা ভরা মন নিয়ে সময়ের গ্রহর গুনে যাচ্ছি। ঘড়ির কাটা কখন ১১টা পেড়িয়ে পৌঁনে ১২টায় পৌঁছে গেছে কারোর খেয়াল নেই। কে যেন বলছিল ভাস্তে আপনারা সিয়ং খেয়ে নাও। তখন সবারই দৃষ্টি পড়ে যায় ঘড়ির দিকে। বিকাল ৩টায় অপারেশনের কক্ষে ঢুকে পড়ি। বুকে সাদা কাপড় চক্ষু ব্যাণ্ডিস করা ৭/৮ ঘন্টা একটানা অপারেশনে সিটে পড়ে থাকা শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেকে দেখে বুক হুঁ হুঁ করে মন কেঁদে উঠলো সারা দেহ রূপ জুড়ে। নিরবে দু' চোখ জুড়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে দুঃখময় ভব সংসার হতে মুক্ত পাওয়ার জন্য যার কাছে আমরা এসেছি সেতো আজ দারুণ কর্মের নিয়তির শিকার। কার মন না কাঁদে! শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের নিত্য প্রতিদিনের স্বপ্ন তিনি থাকতে যেন শিক্ষিত বিনয় ভদ্র ভিক্ষু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে যাহাতে এদেশের বৌদ্ধদের পরিহানি না হয়। তাই আসুন অতীতের সব হিংসা-হিংসি, মারামারি ছাড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে একটি ফ্যামিলির মত ভেবে নিজ নিজ মন চিন্তে মৈত্রী পাহাড় গড়ে তুলি সারা পৃথিবী জুড়ে সুখ স্থাপন করি।

সাধু-সাধু-সাধু

যেমন করিবে কর্ম সেরূপ ফল, পাবে শুধু এ জগতে না হবে বিফল।

কাল ও জীবন

শ্রীমৎ বিমলালংকার ভিক্ষু

আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার

► কল্প, শতাব্দী, যুগ, বছর, পক্ষ দিবা-রাত্রির আকারে কাল আপন গতিতে নীরবে নিস্তব্ধে অবিরত প্রবাহিত হয়ে চলছে। কাল স্থির থাকে না। সাথে সাথে জীবনের বল, বীর্য, আয়ু, সংস্কার, ক্রমান্বয়ে সব কিছু পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। কাল সর্বক্ষণ প্রবাহমান। কালের ন্যায় আকাশে বায়ু প্রবাহ, পাতালে জল প্রবাহ, ভৌতিক দেহে তেজঃ প্রবাহ, অন্তরে চিত্ত প্রবাহ অবিরাম অবিশ্রাম ভাবে প্রবাহিত। এ ভাবের জগতের সব কিছু চলমান, সর্বক্ষণ প্রবাহিত। ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত নদীর স্রোতের ন্যায় ইহা জন্ম হতে জন্মান্তরে প্রবাহমান। ইহা সর্বক্ষণ চলমান। জীবগণ চলমান জগতে চলমান পথিক। যেমন জীব-জগৎ, তেমন বস্তু-জগৎ। ক্ষণিক পরিবর্তনশীল, অনিত্য অস্থির। এটাই মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। কার্য-কারণরূপে এই প্রবাহ সুনির্দিষ্ট নীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেও তার গতি নির্ধারিত করা সুকঠিন। এই প্রবাহকে এক বলাও ভ্রান্তদৃষ্টি, ভিন্ন বলাও মিথ্যাদৃষ্টি। এক নদীতে মানুষের দু'বার অবগাহন হয় না, সন্ধ্যায় দীপ শিখা ও ভোর রাত্রের দীপ শিখাটি একও নয়, ভিন্নও নয়। এটা প্রবাহ, সন্ততি, অবিরত গতিশীল।

এই জগতে এমন কিছু নেই, যা স্থির শাস্ত্বত। সবাই চলমান জগতে চলমান পথিক, পরিনতি বা মৃত্যুমুখী। সুতরাং মৃত্যুর প্রতি এই ভয় উৎপন্ন করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন হতে জীবনকে মুক্ত করার জন্য পুণ্য সংস্কার ধর্ম পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত। যেহেতু কাল জরা-ব্যাধি মৃত্যুর মাধ্যমে সমগ্র জীব জগতকে ও জড়জগতকে গ্রাস করে, ভক্ষণ করে ফেলে। বস্তুত এ কাল কি? কাল বলতে কোন ব্যক্তি-না- কোন শক্তি? এ জিজ্ঞাস্যের জবাবে আসবে না। কাল বলতে কিছু নেই। কালের আদিও নেই অন্তও নেই। অথচ বিশ্বব্যাপী কল্পনা- জগত ও জীবন কালাধীন, কাল নিয়ন্ত্রিত, জীবনের সুখ-দুঃখ কালের উপর নির্ভরশীল।

উত্তান-পতন কালের খতিয়ান সাপেক্ষ। বস্তুত কাল বলতে কোন জড়-চেতনাময় পদার্থ বুঝায় না। কাল মানুষের কল্পনার বস্তু। অথচ এতে সর্বজনবিদিত বিশ্বাস, বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ও সম্মানিত আছে। এই কাল্পনিক বিষয়কে মানুষ নিজ কাজে ব্যবহার করার জন্য বস্তু যন্ত্রে ধরে রাখে। কাল

যন্ত্রের নিয়ন্ত্রনে এ বিশ্ব সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রিত। কাল-জ্ঞান আমাদের সকল বস্তু জ্ঞানের মূলে। সকল বস্তুর অস্থিত কালের উপর নির্ভরশীল। কালবোধ না থাকলে বস্তুর সম্বন্ধবোধ সম্ভবপর হবে কিরূপে? সকল প্রকার অস্থিত বোধের মূলীভূত কারণ যে কাল, তাতো বহিঃ বস্তু নয়। চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্য চিত্ত বৃত্তির মধ্যে যে সম্মতি-বোধ তা কালবোধকে সম্ভব করে তোলে। অতঃএব কাল হল সম্পূর্ণ চিত্ত-বৃত্তিক ধারণা। অবিদ্যা জনিত বাসনা বিক্ষোভ নিরুদ্ধ হলে চিত্ত-বৃত্তিক নিরুদ্ধ হয়। অতঃপর ধর্ম নৈরাত্ম্য ও ব্যক্তি নৈরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্তর মহাশূণ্যতায় বা অনাদি অনন্তকালে পর্যবসিত হয়। শৈশবকাল, কিশোরকাল, যৌবনকাল সব হারিয়ে যখন দেখব রাত্রি কালীন সুন্দর বর্ণগন্ধে পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল রাত্রি অবসানে পচে ঝরে গেছে; ফুলের ন্যায় জীবন কাল গেছে। যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে-লক্ষ-কোটি মুদ্রা মূল্যের বিনিময়ে তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। হায়রে! দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত বসন্তের বায়ুর ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ করতে করতে এই যে প্রাণ বায়ু চলে গেল তা করুণ সুরের মোহ মাত্র। তথাপি চিরজীবী মায়া তৃষ্ণা পরাভব মানতে চাহে না। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য ক্ষণিক। স্নেহ মমতা ভালবাসা এবং সমস্ত মানবীয় সম্পর্কে মৃত্যু নির্মম ভাবে ছিন্ন করে দেয় চোখের সামনে। তথাপি অসীম শক্তিশালী মোহ পরাভব মানতে চাহে না, স্বীকার করে নেয় না, অস্বীকার করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সামান্য একটি ফুলকে গভীর ও করুণ চিন্তার কারণ করে উপলব্ধি করেছিলেন। জর্জ এলিয়ট বলেছেন যে- Every departure is element of the death. প্রত্যেক বিদায় দৃশ্যের মধ্যে মৃত্যুর একটি ছায়াপাত থাকে। মায়া মোহাচ্ছন্ন লোক ধর্মার্থ হিতাহিত, বিচার বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে বসে। রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় সে জগতকে একাকারই দেখে। সে আর উদাস করা বিষন্ন সুরের গান শুনতে রাজি নয়। অথচ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়, চলে যায়। তবু অন্তরের করুণ সুরের মোহে পিছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়, চোখের জল ফেলে। আর যাওয়াটাই সত্য স্বাভাবিক। মোহের আর্কষণ মিথ্যে অস্বাভাবিক। অতএব অনিত্য দুঃখের মাঝে সুখের আশা মিথ্যে।

মোহমলিন এ বিশ্ব। বিশ্বের দৈহিক রূপ, বাহ্যিক রূপ, অনিত্য, অশুচি, দুর্গন্ধময়। কিন্তু, রূপজ মোহের তাড়না এ বিশ্বে কার নেই। সকল জীবের অন্তর রূপজ মোহে আচ্ছন্ন। যাকে বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দে বলা

যায়-“কায়গত মিথ্যা দৃষ্টি”। নিঃসার বস্তু নিরর্থক খেলায় এ বিশ্ব মশগুল। এ মোহই সম্রাট এডওয়ার্ডকে আমেরিকান মহিলা সিমসনের প্রতি আসক্ত করে বৃটিশ সিংহাসনচ্যুত করে ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাঁকে সম্ভ্রষ্ট করতে পারল না। রূপকায় ছাড়া রূপকায়ে একদিনও চলে না। এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হল যে মানুষের মন যখন বাহ্য-দৃষ্টিতে রূপজ মোহে অন্ধ হয়ে যায়, তখন মন আর কিছু দেখতে পায় না। মোহের তাড়নায় তখন মন এত চঞ্চল হয়ে উঠে, জগতে একাকার অন্ধকার ছাড়া আর অন্য কিছু দেখতে পায় না। জীবনের সহস্র বিভ্রান্তি নেমে আসায় দিগ্বিদিক হুঁশ থাকে না। হিতাহিত বোধ হারিয়ে ফেলে। লভ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে বাধা পড়লেই মানুষ ফাঁসির কাণ্ডে বুলে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, বিষ পানে আত্মহত্যা করে, খুন খারাবি করে, আরো কতোই না দুষ্কর্ম সম্পাদন পূর্বক জগতের সর্বাধিক প্রিয় আপনাকে মৃত্যু সর্বগ্রাসী কবলে কবলিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর যখন সকল বিভ্রান্তিকে নিরসন করে চিত্ত প্রবৃত্তি অন্তরমুখী হয়ে জ্ঞান চক্ষু উন্মূলিত হয়, তখন তাঁর জীবনে পরম প্রাপ্তির সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। অবিদ্যা, মোহ, কাম-ক্রোধাদি অকুশল সমন্বিত জগত প্রপঞ্চ হচ্ছে-প্রবৃত্তি রাজ্য। প্রজ্ঞা শাসিত মৈত্রী করুণা, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি হচ্ছে নিবৃত্তি রাজ্য। প্রবৃত্তি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক নিবৃত্তি রাজ্যে গমন করাই বুদ্ধের ধর্ম।

এখানে প্রবৃত্তি রাজ্য সম্পর্কিত একটি বাস্তব গল্প বলিঃ- ভারতীয় এক জন সন্ন্যাসী আমেরিকায় বহু শহর ভ্রমণ করে এক হোটেলে উঠলেন। হোটেলের জানালা দিয়ে অবিদূরে একটি মাটির স্তূপ তাঁর চোখে পড়ল। স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা পাখা হস্তে মাটির স্তূপটি পাংখা করছে। এই দৃশ্য সন্ন্যাসী ঠাকুর দিনেও দেখলেন, সারা রাত্রিও দেখলেন। রাত্রির প্রভাতেও দেখলেন মহিলার অবিরাম পাংখা কর্ম চলছে। তাতে বিরাম নেই। সন্ন্যাসী ঠাকুর আশ্চর্য ভরে প্রাতরাশের পর মাটির স্তূপের নিকট হাজির হলেন এবং মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রে! আপনি সারা দিবা-রাত্রি এই মাটির স্তূপটি পাংখা করছেন কেন? আমি তার তত্ত্ব কিছু বুঝতে পারিনি। মহিলা বললেন-কিছু দিন পূর্বে আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। তাঁকে এই বালির স্তূপে কবর দেওয়া হয়েছে। কবর দেওয়ার প্রাক্কালে মজবুত করার মানসে বালিকাময় মাটিতে প্রচুর জল সিঞ্চন করা হয়েছে। স্তূপটা এখন ভিজ। সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন-অহো! আপনার

পতিব্রতা, সতী সাবিদ্রী-নারী দুনিয়ায় আর দেখিনি। মৃত স্বামীর কবর খোলায় অবিরাম এভাবে সেবা কর্মে নিযুক্ত। জীবিকাকালে আপনি যে কীরূপ পতিব্রতা ছিলেন। বড় আশ্চর্য! সন্ন্যাসী ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রে! আমি এখনো ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। ইহার হেতু প্রত্যয় কি? মহিলা জবাব দিলেন, মহাশয়! আমেরিকান খৃষ্টান সমাজে একটা রীতি আছে, কারো স্বামী মারা গেলে যে স্থানে মৃত দেহ কবর দেওয়া হয় সেই স্থানটা না শুকান পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য আমার এ প্রয়াস। তচ্ছবনে সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাবলেন- হায়রে দুনিয়া! প্রবৃত্তির মর্মভ্রদ পরিহাস। বাসনার বসে প্রবৃত্তির কী সাধনা? এই মহিলা তো একক নহেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিচ্ছবি, প্রতিনিধি।

এই জগতে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। মোহজ ইন্দ্রিয়জ সাংসারিক সুখ বলে মানুষ যাকে কল্পনা করে, আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ না হলেও দুঃখ সত্যের অন্তর্গত। যে হেতু তাও কামনা বাসনা জনিত কল্পনা মাত্র। পরিনতিতে দুঃখ। জগতের স্বাভাবিক অবস্থাই দুঃখময়। বার্মায় এক বিহারে এক ভিক্ষু চার প্রকার দুঃখ সত্য সম্পর্কে জনসভায় দেশনা করলেন। দুঃখ কি? দুঃখের কারণ কি? দুঃখ নিবৃত্তি কীরূপ। দুঃখ নিবৃত্তির উপায়-বা কি, ইত্যাদি। সভায় ছিল বোম্বাই প্রদেশের পঁচিশ বছরের এক যুবক। ভিক্ষুর দেশনায় যুবক বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এত দুঃখের বর্ণনা করলেন, আমারতো কোন দুঃখ নেই। আপনি আমাকে এক্ষুনি একটা দুঃখ দেখাতে পারবেন? ভিক্ষু বললেন- বাপু, তুমি আমার কাছে এস এবং এই আসনে খুব আরামের সাথে বস। তোমার সাথে একটি মাত্র উওয়াদা রইল। তুমি আমার অনুমতি ছাড়া একটুও নড়াচড়া করতে পারবে না। আসন ত্যাগ করে উঠতে পারবে না। যুবক ভাবল-এ আবার কি কথা-বলে আরামের সাথে বসে গেল। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল, যুবক আর বসে থাকতে পারল না। তার উরুদেশে ও কোমরের নিম্ন দেশে ভীষন ব্যথা বেদনার সৃষ্টি হল। সে আর সহ্য করতে পারল না। উঠে পড়ার জন্য বার বার ভিক্ষুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। ভিক্ষু বললেন- আর একটু, আর একটু। অবশেষে অনুমতি পাওয়ার আগেই উঠে পড়ল। যুবক তখন হতবাক। আর কিছু বলল না। একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। ভিক্ষু বললেন- বুঝেছ বাপু, জগতে স্বাভাবিক অবস্থাও দুঃখময়। জীব অবস্থানের পরিবর্তন

কণে কণে কণে সুখের সন্ধান করে মাত্র। শয়ন, উপবেশন, দাঁড়ান ও গমন; দেহের এই চার প্রকার বিন্যাসকে শাস্ত্রীয় পারিভাষিক ভাষায় বলে চার ঈর্ষা পথ। জীব এই চারি ঈর্ষা পথে যে কোন একটিতে জীবন কাটায়। অধিকক্ষণ শয়নে ব্যথা আরম্ভ হলে পাশ পরিবর্তন করে ব্যথা উপশম করে। অতঃপর উপবেশন করে। উপবেশনে অনেকক্ষণ অবস্থান করলে ব্যথা বেদনার সৃষ্টি হয়। তখন দণ্ডায়মান হয়। তাতেও বেশীক্ষণ শান্তি নেই, দুঃখানুভূতি আসে। সেই দুঃখানুভূতি লাঘবের জন্য হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করে। গমনাগমনে কিছুক্ষণ থাকলে এতেও অশান্তি আসে। এই ভাবে জীব সর্বক্ষণ ঈর্ষা পথে পরিবর্তন করে দুঃখের লাঘব বা শান্তি সন্ধানে থাকে। বস্তুত এ জগতে শান্তি সুখ কোন অবস্থানেই পাওয়া যায় না। ইহা জগতের শাস্ত্র বিধান। জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম দুঃখময়।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, দুঃখ নিত্য নয়। দুঃখ নিয়ত পরিবর্তনশীল। সুখও তদ্রূপ-নিত্য নয়। সুখ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিশেষতঃ পঞ্চকাম গুণে জড়িত সুখ সমূহ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এখানে করুণাঘন বুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এক মাত্র নির্বাণই শাস্ত্র সুখ ও শান্তির অনন্ত আঁধার। “নিব্বানং পরমং সুখং”।

জগত দুঃখময়, দুঃখে পরিপূর্ণ, দুঃখ আছে, দুঃখ আর্ষ সত্য। জগতের নির্বাণ ব্যতীত কোন কিছুই নিত্য নহে, অনিত্য আর অনিত্য বলে জগত দুঃখময়। সত্ত্বগুণের জীবন এক নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ ধারায় চলতে থাকে। বিদ্যুৎ বলকের মত মূহুর্তের জন্য সুখানুভূতি অনুভূত হলেও আবার মূহুর্তের মধ্যেই তা বিষাদে পরিণত হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন মোহান্ধকার মানব ক্ষণিকের সুখকে সুখ মনে করে। এটাই হচ্ছে বড় ভ্রান্ত ধারণা। সে চায় জীবনে ভোগ করতে পরিপূর্ণ ভাবে রঙ্গে রসে মেতে থাকে। তার প্রকৃত দৃষ্টিতে সংসার খেলা অফুরন্ত যেখানে শুধু ভোগ আর ভোগ। ভোগে যেন তৃষ্ণা মিঠে না। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দেহ যে কত ভয়াবহ তাতে কোন হুঁস নেই। যেমন যৌবনের রঙ্গ রসানুভূতি যখন জরায় জীর্ণ হয়, বার্ধক্যে রোগে ব্যাধিতে বৃদ্ধ কালে নুয়ে পড়ে নিস্তেজ হয়, তখন অনুশোচনা দুঃখ ছাড়া কিছুই থাকে না। এ দুঃখ থেকে কারো নিস্তার নেই। জন্ম জন্মান্তর ধরে জীব সকল এ দুঃখ ভোগ করে আসছে। এ দুঃখ সার্বজনীন সর্বকালের। জগৎ ও জীবন যেহেতু অনিত্য আর অনিত্য বলেই তা দুঃখময়। একমাত্র দূরদৃষ্টিহীন লোকই জগত এবং জাগতিক সুখকে সুখ

মনে করে। সংসার সংসারী সেজে থাকলে দুঃখ ভোগ করতে হবে এর থেকে মুক্তি নেই। বুদ্ধ দুঃখ সত্যকে নিরীক্ষা করে দেখেছেন এটা কারো বা কোন অদৃষ্ট শক্তির ইঙ্গিতে খেয়াল খুশিমত আকস্মিক বা দৈব ঘটনা বশতঃ সংঘটিত হয় না-এ দুঃখ কারণঃ প্রসূত এবং স্ব স্ব কৃত কর্মেরই ফল।

জীবন কেন দুঃখময়? যা চাই তা পাই না, যা চাই না তা আসে। সুখকে স্থায়ী ভাবে পেতে চাই এবং দুঃখ এক মূহুর্তে জন্যও চাই না কিন্তু বাস্তবে ঘটে এক বিপরীত। সারা জীবন সুন্দর রূপ যৌবন শক্তি সমর্থ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই কিন্তু চাইলেও তা বরং উল্টো হয়। মান-সম্মান যশ কীর্তি ধন সম্পদ স্ত্রী পুত্র পরিজন সব সময় আমার আয়ত্বে থাকুক এটাই চাই কিন্তু সবই আমার অবাধ্য হয়। প্রিয়জনের মধুর সঙ্গ এবং প্রিয়জনকে এক মূহুর্তের জন্যও হারাতে চাই না তবুও চিরতরের জন্য হারাতে হয়। রোগ ব্যাধি চাই না তবুও নানা রকম রোগ ব্যাধি আমার নিত্য সঙ্গী। এ সুন্দর ভূবনে মরতে চাই না, তবুও সদা সর্বদা মৃত্যুর দিকে নিজেকে সমর্পন করছি। অবাঞ্ছিত অপ্রিয় ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে চাই, ভ্রমেও অপ্রিয় সাহচর্য কামনা করি না তবুও অদৃষ্টের ত্রুর পরিহাসে চলতে হয় অবাঞ্ছিত অপ্রিয় জনের সঙ্গে। এ অপ্রিয় সংযোগ যে কত দুঃখময় তা ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝতে পারেন। এ রহস্যময় না পাওয়ার মধ্যে জীবন স্রোতে চলতে থাকে নিজের করায়ত্বে কিছুই নেই। অতএব জীবন দুঃখময়।

এই জীবন অনিত্য দুঃখময়। জীবন কর্মময়, বড় সংকটাপন্ন। মানুষের জীবনে অশুভ পাপ কর্ম হচ্ছে লৌহ শৃংখল আর শুভ পুণ্যময় কর্ম হচ্ছে-হীরক শৃংখল। উভয়ই কর্মই কিন্তু সংসার কারাগারের সুদৃঢ় বন্ধন। এটার হেতু হচ্ছে-মায়া, মোহ, অবিদ্যা, আসক্তি। আর কর্মের উপশম বা নিরোধ হচ্ছে সাধনা প্রভাবে মায়া মোহপুর বা প্রবৃত্তি রাজ্য থেকে প্রত্যাবর্তন পূর্বক নিবৃত্তি রাজ্যে প্রবেশ করা। উপায় হচ্ছে- মহামানবের মার্গ বা পথে অপ্রমাদ চিন্তে গমন করা। যাঁরা জীবন দুঃখের অবসান ঘটিয়ে চির শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে পথ রচনা করে অপেক্ষমান, তাঁদের সান্নিধ্যে চলে যাওয়া দুঃস্থ মানবের কর্তব্য।

কামনা বাসনা তাড়নায় হিংসা ক্রোধের উত্তেজনায় বিষয় বিষের দংশনে, বিকারের জীর্ণতা শীর্ণতায় অতৃপ্ত জ্বলন্ত জীবনে জগৎ করুণ

ক্রন্দনে দক্ষীভূত হওয়া ব্যতীত গতন্তরহীন, ভাষাহীন, উদাসীন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিরহ রোদনের ব্যর্থ মনোবেদনা উপলব্ধি করে ভৈরবী গান কবিতায় বলেছেন,-

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,

হল না, কিছুই হবে না।

এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু রবে না।

কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত

ধুলি হতে তুলি লবে না।

জগতের এই অনিত্যতা, দুঃখময়তা ও নিঃসারতা নামক বৌদ্ধনীতি আদর্শ পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। ঐ জগৎ মায়াময়। জরাব্যাদি ও মরণ ধর্মের অধীন। সব কিছু অস্থায়ী। সামাজিক সূত্রে, “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরে তরে”। বস্তুতঃ জীবনের গহীন মর্মে আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় কারো দায়িত্বে কারো করণীয় কিছু নেই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাল-মন্দ কর্মাধীন।

সাধু-সাধু-সাধু

আত্ম নির্ভরশীল হও

স্মৃতিযোগ শ্রামণের

টিন টিলা বন বিহার, লংগদু

“অন্তাহি অন্তনো নাথো, কোহি নাথো পরোসিয়া, অন্তনাহি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং। (ধম্মপদ)

অর্থাৎ-আত্ম নির্ভরশীল হয়ে সংকর্ম সম্পাদনে রত হও।

প্রত্যেকেই নিজেই নিজের ত্রাণ কর্তা বা প্রভু অন্য কোন ত্রাণকর্তা বা প্রভু নেই। নিজেকে সুদান্ত বা সংযত করতে পারলে যে কোন দুর্লভ সিদ্ধি লাভে মানুষ সামর্থ্য। আত্ম নির্ভরশীল না হয়ে কারো পক্ষে কোন প্রকার কাজে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। আত্ম প্রতিষ্ঠিতাই সর্ববিধ মহত্ব লাভে ভিত্তি। আমরা অনেক পুণ্যের ফলে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। তাই আমরা জন্ম নিয়েছি বৌদ্ধ কুলে। যেখানে মৈত্রী করুণার বাণী বিদ্যমান আছে। মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। আসা যাওয়ার মাঝখানে অতি অল্প সময় সেই সময় টুকু বৃথা নষ্ট না করে, বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতি শরণাপন্ন হতে হবে। এবং দান, শীল, ভাবনায় রত থাকতে হবে। মানুষ

মরনশীল মানুষের জীবন রক্ষা করা খুবই কঠিন। কেননা মানব দেহতা পচনশীল ক্ষয়শীল ও অনিত্য, তবুও মানুষ এত হাসি আর আনন্দে দিন কাটিয়ে চলতেছে। মানুষ প্রতিনিয়ত অন্ধকার থেকে অন্ধকারে চলে যাচ্ছে। চিত্ত দ্বারাই প্রতিটি মানুষ পরিচালিত হয়। চিত্তই মানুষকে কুকর্মের ফলে নিম্নতর নরকে নিয়ে যেতে পারে। আবার এই চিত্তই মানুষকে সৎকর্মের ফলে পরম শান্তি নির্বাণে এগিয়ে যেতে সক্ষম। বাস্তবিক পক্ষে পরিচালনার গুণে এই চিত্তই মানুষের নিষ্ঠুরতম শত্রু হতে পারে। আবার পরিচালনার গুণে এই চিত্ত মানুষের মহত্তম বন্ধু রূপে পরিগণিত হতে পারে। শত্রু শত্রুর যতখানি ক্ষতি করে, বিপদগামী চিত্ত তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি সাধন করে। মাতা-পিতা কিংবা জ্ঞাতিবর্গ যে উপকার করতে পারে, সৎপথে পরিচালিত চিত্ত মানুষের ততোধিক উপকার সাধন করতে পারে। চিত্তকে সৎপথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একমাত্র বীর্য শক্তি দৃঢ় মনোবল। মানব মাত্রেরই যথা শক্তি দান দেওয়া কর্তব্য। দানের ফল বহু বিধ ও অপ্রমেয়। যেমন কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের সর্বোত্তম দান। প্রতিটি বৌদ্ধ দেশে এ দান কার্য যথাযোগ্যে মর্যদা সহকারে সম্পাদিত হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমার পর দিন হতে কার্তিকী পূর্ণিমার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে যেকোন দিন কঠিন চীবর দান করা যায়। বৎসরের অন্যান্য সময়ে এ দান করা বিধান নেই। বুদ্ধ শাসনে যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে কঠিন চীবর দানই সর্বাপেক্ষা পুণ্যজনক। দান মানুষের ত্রাণ কারী, দান মানুষের দুর্গতি বারণ করে। দানের দ্বারা মানুষের ইহকালেও সুখ শান্তি আনায়ন করে। দানের দ্বারা মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি, ব্রহ্ম সম্পত্তি, অস্তিমে নির্বাণ সম্পত্তি লাভ করা যায়। তাই দান দেবার আগে মনের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে হবে। শ্রদ্ধা হচ্ছে কর্ম ও কর্ম ফলের প্রতি বিশ্বাস। তবে এটা অন্ধ বিশ্বাস নহে, যুক্তি সঙ্গত বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। বিত্তহীন যেমন ভোগ সুখে বঞ্চিত, বীজহীন হলে যেমন শস্যাদি লাভ হয় না। তেমনি শ্রদ্ধা না থাকলে দান, শীল, ভাবনাদি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা যেতে পারে না। এ জন্যেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে পঞ্চ নীবরণ ক্ষীণ হয়ে যায়। পঞ্চ নীবরণ গ্রহীন চিত্ত কলুষবিহীন, নির্মল ও সুপ্রসন্ন হয়। লোভ মানুষকে করে ভোগী। আর অলোভ মানুষকে করে ত্যাগী। তাই কৃপনতা ত্যাগ করে সবাই দান দেওয়া কর্তব্য। দাতা দান করার সময় যারা সন্তোষের সাথে সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করে এবং

যারা উৎসাহের সাথে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা দান কার্যে সহায়তা করে তারাও পুণ্যাংশের ভাগী হয়। দাতার পুণ্য ফল হ্রাস পাই না। এই পুণ্য কর্ম পরলোকে প্রাণীদের প্রতিষ্ঠা কারণ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেও দান করে না এবং অপরের দান কার্যে বাধা বা অন্তরায় সৃষ্টি করে। তার বহু অপুণ্য সঞ্চিত হয়। সে এক দিকে যেমন দায়কের পুণ্য অন্তরায় করে। অন্য দিকে গ্রহীতার লাভের অন্তরায় করে। এবং নিজের জন্য ও অকীর্তি সঞ্চয় করে থাকে। যেমনি ক্ষেত্র শূন্য ব্যক্তি ফসলের আশা নিষ্ফল হয়, তেমনি দানহীন ব্যক্তির ও ভোগৈশ্বর্যের আশা নিষ্ফল হয়। কোন কর্ম এক বার সম্পাদন করলে অনন্তকাল পর্যন্ত এর নৈতিক ফল ফলতে থাকে। এ কর্মের ফল অখণ্ডনীয়। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, উদারতা দয়া পরোপকার প্রভৃতি সৎকর্ম এ অন্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে। এটা জীবনকে স্বর্জীব ও আশাপ্রদ করা। এটা পৃথিবীতে বৌদ্ধ সভ্যতাই এক মহান অবদান। তাই সবাইয়ের দরকার দান, শীল, ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে। দান হচ্ছে বড় পুণ্যময় কাজ। বার বার করলে জন্মে জন্মে ভোগ সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়। দানের প্রভাবে ভোগ্য বস্তুর অভাব কোন দিন ভোগ করতে হবে না। আর শীল হচ্ছে সেতু, সদাচার সৎচরিত্র গঠনের হাতিয়ার। সৎচরিত্রবান ও সৎ জীবনের অধিকারী হতে চাইলে শীল পালন ও শীলের অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। তাই শীল পালন করলে সৌভাগ্য সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। অকুশল কর্ম হলো দুঃখ দারিদ্র্য রোগ, শোক কদাকার কুৎসিত চেহারা স্বল্পতর জীবন ইত্যাদি প্রাপ্ত হতে হয়। কুশলাকুশল কর্ম যখন লৌকীয় চিন্তের কর্ম হয় তখন তার বিপাকও লৌকীয়। এইরূপে জীব কর্ম ও বিপাক নিবন্ধন ভব সমুদ্রে জন্ম মৃত্যুর আকারে ভাসিয়া ডুবিয়া চলছে, এটাই সংসার প্রবর্তন। কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব তা দেখেও বুঝতে পারে না। কারণ মানুষের যাবতীয় অকুশল পাপ জনক প্রধানত দুই কারণে সম্পাদিত হয়। অবিদ্যা ও তৃষ্ণার কারণে মানুষের মধ্যে লোভ, দ্বেষ, মোহ, উৎপত্তি হয়। যার ফলে মানুষ অকুশল বা পাপ কর্ম করতে দ্বিধাবোধ করে না। অবিদ্যা মানে বিদ্যার অভাব। এই জ্ঞান সংসারের বৈষয়িক জ্ঞানের বহু উর্ধ্বে অর্থাৎ সাংসারিক জ্ঞানের অতীত মানে অবিদ্যা নয়। অবিদ্যা হচ্ছে যা কোন কিছু স্বভাব জানতে দেয় না। এবং বিপরীতবোধের সৃষ্টি করে। নাম-রূপ, কিংবা পঞ্চস্কন্ধের প্রভাণ জানতে দেয় না বলে অবিদ্যা। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও নিদ্রাণ।

এই পঞ্চ উপাদান যে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম স্বভাব সম্পন্ন না জানাই অবিদ্যা। জীবন দুঃখের কারণ তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণা নিরোধ দুঃখের নিরোধ এসব না জানা অবিদ্যা। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুযায়ী জীবন যাপন যে তৃষ্ণা নিরোধের একমাত্র উপায় এতে না বুঝা অবিদ্যা পুনর্জন্ম বা বার বার জন্ম ধারণ দুঃখকর এটি না জানা অবিদ্যা। কোন কিছু পাবার জন্য তীব্র আশা আকাংখা বা চেতনা তা হচ্ছে তৃষ্ণা। যার অন্য নাম হচ্ছে পুনর্জন্ম প্রদানকারী কর্ম বা সংস্কার। তৃষ্ণা হচ্ছে লোভ বা আসক্তি তাই এই অবিদ্যা তৃষ্ণার কারণে লোভ, দ্বেষ, মোহ উৎপত্তি হচ্ছে। অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, কুশলের মূল হেতু। লোভ অকুশলের মূল কর্ম বৃদ্ধি করে। কিন্তু অলোভাদি কুশলের মূল কর্ম নিরুদ্ধ করে কর্ম বৃদ্ধি করে না। তবে বুদ্ধ বলেছেন, অলোভ দানের হেতু। অদ্বেষ শীলের হেতু এবং অমোহ ভাবনার হেতু। দান, শীল, ভাবনা এই তিনটি কুশল কর্ম তবে এই তিনটির মধ্যে দান ও শীলের দ্বারা সম্পাদিত কুশল কর্ম অপেক্ষা কৃত দুর্বল। এ সবার দ্বারা মনুষ্য লোক ও দেব লোক লাভ করা যায়। ভাবনা বা সাধনার দ্বারা সম্পাদিত কুশল কর্ম সবচেয়ে বলবান এবং সর্বোত্তম। এর সাহায্যে সর্বোচ্চ স্তরের মার্গ ফল অর্থাৎ অরহত্ব লাভ করা যায়। চিত্ত প্রবাহের এক অবস্থায় যে ফল দৃষ্ট হয়। তা অন্যের ভোগ্যও নহে অন্য হতে সংক্রমিতও হয়নি। যে প্রবাহের পূর্বাবস্থায় কর্ম সংস্কার গঠিত হয়। বিবর্তন অনুসারে উত্তর কালে সে প্রবাহের ফল প্রকটিত হয়। কর্ম সম্পাদনে ও ফল ভোগের মধ্যে শত সহস্র জন্ম, বহু দেশ ও কল্পকোটি কালের ব্যবধান থাকতে পারে। কিন্তু কর্ম ও ভোগের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটে না। যেমন সহস্র গাভীর মধ্যেও বাছুর তার নিজ মাতাকে বেছে লয়, তেমনি পূর্ব কৃত কর্মও অসংখ্য জীব গণের মধ্যে কতাকেই অনুসরণ করে। কর্ম তাকেই বিপাক দান করবেই। ভোগ ছাড়া কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, ভোগই এর পরিসমাপ্তি। নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত কর্ম ও কর্ম ফল রূপ সংসার প্রবাহ যতদিন প্রবাহিত হতে থাকবে, ততদিন জীব দুঃখ ভোগ করতে অনন্তকালচক্রে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকবে। তাই মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য চাহিদা বা কামনা বাসনা পূরণ করতে মানুষ কত যে পাপ কর্ম সম্পাদন করে এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, প্রভৃতি আপন জনের ভরণ-পোষণ ও চাহিদা পূরণ করতে মানুষকে বিবিধ অকুশল কাজ সম্পাদন করতে হয়। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথা, মাদক দ্রব্য

সেবন ইত্যাদি অপকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই অপকর্মের পরিণতির ভয়াবহতা মানুষ ভুলেও চিন্তা করে না। অকপটে করে যায় যাবতীয় অকুশল কর্ম, মৃত্যুর পর কি গতি হবে, সঙ্গে কেহ যাবে কি, পাপ কর্মের ফল কেহ ভোগ করবে কি-এসব চিন্তার সময় নেই মানুষের। অবিদ্যা ও তৃষ্ণা অন্ধকারাময় আবরণ সৃষ্টি করে মানুষের মনের পর্দায়। ঐ আবরণ ভেদ করে সত্য জ্ঞানের আলো বিকশিত হতে পারে না। যখন মানুষ রোগ, শোক, বার্ধক্যে ও অভাব অনটনের কারণে পূণ্যে চেতনা উৎপত্তি করে, তখন কুশল কর্ম করতে পারে না। কারণ ব্যাধিতে ভুগে ভুগে মানুষ ভোগ বিলাস বঞ্চিত হয়। অথবা প্রিয়জনের বিয়োগে বীতশ্রদ্ধ হয় কিংবা বার্ধক্যের জরাজীর্ণ অবস্থায় শক্তি সামার্থ্য হারিয়ে ফেলে, অথবা সৌভাগ্য সম্পদ নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে। যখন এভাবে দুঃখে পড়বে, তখন মানুষ দান, শীল, ভাবনা পালন করতে ইচ্ছা করে। অর্থাৎ কিভাবে দুঃখ থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় মনে চিন্তা উদয় করে। তখন ইচ্ছা করলেও সুখ আনায়ন করতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হস্তহীন ব্যক্তি যেমনি রত্নাদি দর্শন করলেও গ্রহণ করতে অক্ষম, তেমনি মানুষ ব্যাধিতে ভুগে ভুগে ইচ্ছা করলে সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারে না। তাই মানব জাতি সার্বিক উন্নয়ে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে সমান সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্য ও মৈত্রীর সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। যারা জীবনকে সত্য সুন্দরের পথে এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক এবং জীবনের স্বার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভের প্রত্যাশী। তারা বুদ্ধের শাসনে নিয়ম-নীতি অনুসারে আচরণ করলে তাদের জন্যে বিমুক্তি দ্বার উন্মুক্ত হতে পারবে।

সাধু-সাধু-সাধু

কর্ম ও কর্ম ফলের বিশ্বাস

হৃদয়ানন্দ চাক্‌মা (রাঙ্গা)

সামিরাপাড়া

বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে কর্মবাদি ধর্ম। যে, কর্ম ফলকে বিশ্বাস করে তারাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। আর যে, কর্ম ফলকে বিশ্বাস করে না তারাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী নহে। তাই কেহ কেহ বলেছেন জ্ঞানের ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। পৃথিবীতে মানুষ সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণী। ভাল মন্দ বিবেচনা করার একমাত্র রয়েছে তাদের, তাই যারা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে চান তারা দারুণ দুঃখ প্রদানকারী কর্ম সম্পাদন হতে সতর্কতা অবলম্বন করেন। মানব জীবন লাভ করেও যদি দেখে শুনে মন্দ বা খারাপ কর্ম সম্পাদন হতে বিরত থাকতে না পারে তাহা মানবের পক্ষে বড়ই দুঃখের বা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। কর্ম ভেদে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম। তবে বলা যেতে পারে যে, কর্ম-কোথাও স্থিত থাকে তা নির্দিষ্ট করে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। আমরা জাতকের গল্পে দেখতে পাইঃ লোশক নামে এক ব্যক্তি পূর্ব জন্মে একজন বিদ্যান ভিক্ষু ছিলেন। প্রতি হিংসা বশতঃ তিনি আরেকজন শীলবান সাধক ভিক্ষুর খাদ্য ব্যাঘাত করলে, তার ফলে জন্মান্তরে এক চণ্ডাল গ্রামের এক চণ্ডালিনীর গর্ভে গর্ভাধান লাভ করেছিলেন। গর্ভাধান কাল থেকে গ্রাম শুদ্ধ সকল বাসিন্দার অর্থ সঙ্কট দেখা দিল, অর্থ সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে অনেক ভাবনার চিন্তার পর, গ্রাম বাসিন্দাগণ গ্রামটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করল। কিছু দিন পর দেখা গেলঃ এক ভাগে আর্থিক সঙ্কট আর নেই, অপর ভাগে পূর্বের ন্যায় দারুণ সঙ্কট রয়ে গেল। এই ভাবে ক্রমশঃ পাড়া ভাগ করল, বাড়ী ভাগ করল। অবশেষে এক গর্ভবতী রমণীকে 'এটাই কালকর্ণী' বলে গ্রাম থেকে নির্বাসন করলে গ্রামে পূর্বের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসল। এদিকে গর্ভবতী নারীটি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরেঃ ঘুরে বেড়ায়, খাদ্যান্বেষণে করে, কিন্তু খাদ্য জুটাতে পারছে না। এমন সময় তার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। পুত্রের নামকরণ হলো-লোশক। ক্রমশঃ লোশকের শৈশবকাল উত্তীর্ণ হলো। নিদারুণ খাদ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, তাঁর জননীও তাঁকে ত্যাগ করে পলায়ন করল। এখন লোশক অসহায়, সারা দিন ঘুরাফিরা করেও এক মুষ্টি ভিক্ষা জুটাতে পারে না। তাই আবর্জনা জুপের অখাদ্য খেয়ে জীবন কাটাতে থাকে এবং পথে ঘাটে পাড়ে থাকে। এক দিন

তথাগত বুদ্ধের প্রধান শিষ্য-শারীপুত্র মহাস্থবির বিচরণ কালে পথি পার্শ্বে শায়িত লোশককে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। শারীপুত্র মহাস্থবিরের সাহচর্য্যে থেকে লোশক রীতিমত শিক্ষা সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুদিন পর তাঁকে শিষ্য করে নিয়ে যখন যে শিক্ষা দিতে লাগলেন, অনায়াসে, অতি দ্রুত গতিতে লোশক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। শিক্ষা ও সাধনার পথ ছিল তাঁর পক্ষে একেবারে প্রশস্ত। তথাপি খাদ্য সঙ্কট সারা জীবনের জন্য ত্যাগ করতে পারেন নি। কেউ লোশককে খাদ্য-দ্রব্য দান করলে, তা অদৃশ্য হয়ে যেত। সম্মুখে প্রচুর খাদ্য উপস্থিত থাকলেও তিনি খেতে পেতেন না। এমন কি, শারীপুত্র মহাস্থবির লোশককে সাহচর্য্যে এনে নিজেও খাদ্য সঙ্কট কম ভোগ করেন নি। এমনি ছিল-তাঁর পূর্ব জন্মোজ্জিত দুষ্কর্মের নিদারুণ বিপাক। সাধক ভিক্ষুর খাদ্যান্তরায় জনিত দুঃখময় ফল ভোগ করলেও শিক্ষা ও সাধনার প্রভাবে অল্প কালের মধ্যেই উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। এভাবে লোশকের জীবনে পাপ পুণ্যময় কর্মের দ্বিবিধ নিশান সারা জীবন ব্যাপি উড়ে দিল। আমরা দেখতে পাই,- কর্ম অদৃষ্ট, পূর্বকোটি অজ্ঞাত। কোন অতীতকল্পে কি সূত্রে বা কিরূপে কর্মের আরম্ভ হয়েছিল,-তা নিরূপণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার। পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ইহ জীবনে তা ভোগ করছি। পূর্ব কর্মের বিপাক স্বরূপ দেহ-মন লাভ করেছি। বর্তমান যে কর্ম করছি, আবার ভবিষ্যৎ জন্মে তা ভোগ করব। কর্ম-বীজ হতে জন্ম-বৃক্ষ, আবার জন্ম-বৃক্ষ হতে কর্ম বীজ। আবার জন্ম, আবার ভোগ। এরূপে কর্ম ও বিপাকের ধারা অনাদিকাল হতে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এখন প্রশ্ন জাগে যে, এই কর্ম প্রবাহ কি অনন্ত কালাবধি চলতে থাকবে? জীবকে কি কর্মভোগের অবিরাম গতিতে চলতেই হবে? এই গতির কি নিবৃত্তি নেই? অতএব সুখ-শান্তি লাভের একমাত্র উপায় সদ্ধর্ম্মাচরণ এবং অধর্ম আচরণের অবশ্যাস্ত্রী ফল-দুঃখ। তাই জ্ঞানীরা বলেছেনঃ 'সুখং হি জগতামেকং কাম্যং ধর্মে ন লভ্যতে'। অর্থাৎ-জগতের একমাত্র কাম্য বস্তু যে সুখ এবং শান্তি-তা ধর্মের দ্বারাই লাভ হয়। অধর্ম্মাচরণ কেবল দুঃখই বহন করে। অধর্মের গতি নরকাভিমুখী এবং ধর্ম ধার্মিককে স্বর্গে ওগা পরম-নির্ব্বাণে উপনীত করে। এখন নির্দ্ধিধায় বলা যায় কুকর্মও সুকর্ম জীবগণ নিজেই করে থাকে এবং তদনুযায়ী তার ভাল মন্দ কর্ম ফল করে। কেননা কর্মই জন্মেই মূল কারণ। তাই শ্রদ্ধেয় বনভাঃ ৭৭৭৭।

অবিদ্যাতে বিদ্যা উৎপন্ন কর, বিদ্যা উৎপন্ন হলে কোন কর্মে নিযুক্ত থাকতে হবে না। তোমরা কর্ম ধ্বংস কর, নানাবিধ কার্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। বার বার জন্ম গ্রহণ করা দুঃখজনক। কর্ম ধ্বংস করা এবং পুনর্জন্ম না হওয়াই নির্বাণ।

সাদু-সাধু-সাধু

প্রসঙ্গঃ বৌদ্ধ ধর্ম

টিটো চাকমা (চিঙি)

চকপতিঘাট, জুরাছড়ি

যে বয়সে মানুষ সাধারণত লোভ, দ্বेष, মোহে আচ্ছন্ন থাকে অথচ সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে আশাঢ়ী পূর্ণিমার এক নিশিথে পরিবার, পরিজন, রাজ্যপদ ত্যাগ করে মুক্তির পথ অন্বেষণে অজানার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেন। বৃদ্ধলোক, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, মৃতদেহ এবং সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখে মানুষের দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজতে থাকেন।

সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের পর প্রথমে তৎকালীন কয়েকজন তীর্থঙ্করের দারস্থ হন। তাদের কাছে মুক্তির পথের সন্ধান না পেয়ে “একলা চলো” নীতি অবলম্বন করেন। অবশেষে বর্তমান গয়ার বোধিবৃক্ষে সুদীর্ঘ ৬ বৎসর যাবত কঠোর ধ্যান করে ৩৫ বছর বয়সে “বুদ্ধত্ব” লাভ করেন। তাঁরই প্রবর্তিত ধর্মের নামই বৌদ্ধ ধর্ম বা বুদ্ধের ধর্ম। এই ধর্মের নীতি যারা মেনে চলেন তারাই “বৌদ্ধ”। দেবদত্ত কর্তৃক তীরবিদ্ধ আহত হংসকে সেবা করার মধ্য দিয়ে রাজ কুমার সিদ্ধার্থ প্রাণীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় মৈত্রী বা বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল অর্থ হচ্ছে “মৈত্রী”। সাধারণভাবে “মৈত্রী” শব্দের অর্থ মিত্রতা বা বন্ধুত্ব। মৈত্রী প্রাণীর প্রতি পবিত্র সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাই “করণীয় মেত্তা” সূত্রে বলা হয়েছেঃ-মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্খে, এবম্পি সত্ত্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। অর্থাৎ-মাতা যেমন নিজের গর্ভজাত একমাত্র সন্তানকে আপন জীবন দিয়ে হলেও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, তেমনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সীমাহীন প্রীতিময় মৈত্রীভাব সৃষ্টি করবে।

তথাগত ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে উপলক্ষ করে বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী ভাবনা জীবনে এক উপকারিতা সম্বন্ধে দেশনা দিয়ে গেছেন। মৈত্রী

ভাবনাকারী বা বৌদ্ধ ধর্মের নীতি পালনকারী ব্যক্তি ১১ (এগার) প্রকার ফল লভে সক্ষম হতে পারেন। (১) সুখে নিদ্রা যান। (২) সুখে জাত হন। (৩) কোন পাপ স্বপ্ন দেখেন না। (৪) মনুষ্য গণের প্রিয় হন। (৫) অমনুষ্য গণেরও প্রিয় হন। (৬) দেবগণ আপন পুত্রবৎ রক্ষা করেন। (৭) অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন না। (৮) ভাবনায় শীঘ্রই চিত্ত সমাধিস্থ হন। (৯) মোহ মুক্ত চিত্তে নিদ্রাক্রান্তের ন্যায় সজ্ঞানে মৃত্যু বরন করেন। (১০) মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়। (১১) এবং মার্গফল লাভ না করলেও মরণের পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

আজকের হিংসা হানাহানি ও সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি স্থাপনে কতো সংস্থা, সংগঠন গঠিত হয়েছে বা হচ্ছে। তার পরও সোনার হরিণ সেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। অথচ ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ তথা বিশ্ববাসী যদি “বুদ্ধ” নীতিকে একমাত্র শান্তি স্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতো হয়তো অশান্তির নিষ্পত্তির সম্ভাবনা থাকতো। এ প্রসঙ্গে ধর্ম পদের দণ্ডবর্গের শ্লোকের বাণী বলা হয়েছেঃ-“সর্বো তসন্তি দণ্ডস্ সর্বোৎস জীবিতং পিৎং অন্তানং উপমং কত্বা ন হন্যে ন ঘাতয়ে। অর্থাৎ-তুমি যেমন দণ্ডকে ভয় কর, সকলেই সেইরূপ দণ্ডকে ভয় করে। তোমার কাছে যেমন প্রিয়, সকলেরই তেমন প্রিয়। নিজের মনে করে স্বয়ং অন্যকে মারিও না বা মারার আদেশ দিও না। বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম এত সহজে প্রচার করতে পারেননি। তাঁকে ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে অনেক বাঁধার প্রাচীর অতিক্রম করতে হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে কথিত মার রাজাতো সেই বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব থেকেই তাঁর পেছনে লেগেছিল। ভগবান বুদ্ধকে নানা ভাবে ধ্যান ভঙ্গ করার প্রয়াস চালিয়ে ছিল। গৃহী জীবনের নিকটাত্মীয় দেবদত্ত আমরণ বৌদ্ধ নীতির বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ নীতি বা বুদ্ধের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। জয় মঙ্গল অটুট গাথায় বর্ণিত খড়্গ হস্তে ধাবমান অঙ্গুলিমালকে এবং উন্মত্ত নালাগিরি হস্তীকে বশীভূত করতে ভগবান বুদ্ধ কোন অস্ত্র প্রয়োগ করেননি। শুধু মাত্র মৈত্রী অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়েছিল। এ অস্ত্রের নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। চোখে দেখা যায় না, শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। মৈত্রী ভাবনার শুরুতেই নিজেকে নিয়ে বলা হয়েছে ; আমি সুখী হই, বৈরীহীন হই, দ্বেষহীন হই এবং নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করি। এভাবে গাণ বার শুভ চিন্তা করতে করতে মন যখন প্রসন্ন হয়, তখন মৈত্রী ভাবনা

ক্রমশঃ অপরের দিকে প্রসারিত করতে বলা হয়েছে। নিজের মঙ্গলের কথা ভাবতে ভাবতে চিন্তা করতে হবে আমি যেমন সুখ চাই, দুঃখকে ভয় করি, তেমনি অপর সকলেই সুখ চাই, দুঃখকে ভয় করে। এভাবে নিজেকে দিয়ে শুরু করে পরে অপরের চিন্তা করতে বলা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মে।

একজন পবিত্র ধর্মাবলম্বী মতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৌদ্ধ ধর্মের নীতি ও শৃঙ্খলাকে ভালোবেসেছেন। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে কোন অপবিত্রতার স্পর্শ নেই। তাইতো মঙ্গল সূত্রে বলা হয়েছেঃ- “অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা, পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং” অর্থাৎ-পাপী, অজ্ঞানী লোকের সেবা না করা, কুসংসর্গে বাস না করা, পণ্ডিত জ্ঞানীগণের সেবা করা এবং তাদের সংস্রবে থাকা এবং পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা এই তিনটি উত্তম মঙ্গল।

এই মঙ্গল সূত্রে আরো কথিত আছে-“মাতা-পিতৃ উপট্ঠানং পুণ্ডদারস্স সঙ্গহো, অনাকুলা চ কম্মত্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং”

অর্থাৎ-মাতা পিতার সেবা করা, ভরণ-পোষন ও সদুপদেশ দ্বারা স্ত্রী-পুত্র কন্যার উপকার করা, কৃষি কর্ম-বাণিজ্য-কর্মদি নিষ্পাপ ব্যবসা করা এই তিনটি উত্তম মঙ্গল।

সুতরাং শান্তি প্রত্যাশী মানুষ আমরা বাস্তব জীবনে এই বৌদ্ধ ধর্ম নীতি কতোটুকু মেনে চলি সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

সাধু-সাধু-সাধু

বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী

নীতিভূবন চাকমা

আমতলী পাড়া, জুরাছড়ি

ধর্ম শব্দ দ্বারা যা বুঝায় সে অর্থে এটা কোন ধর্ম নয় ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের নিকট হতে অন্ধ বিশ্বাস দাবী করে না। দাবী হচ্ছে সঠিক ধর্ম গ্রহণের মূল লক্ষ্য। আমি এক সময় নির্জন, নীরবে বিছানায় শুয়ে হাতে একটি বই তুলে নিই, বইয়ের পৃষ্ঠা যখন খুলতে শুরু করি তখন হঠাৎ আমার চোখে পড়ল সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা (শিক্ষাবিদ) ও বাণিজ্যিক পরামর্শ দাতা স্বনামধন্য কৃতি উদ্যোক্তা এবং অনুসরণযোগ্য বক্তা যার নাম শিগেখেরা। তাঁর লেখা পাঠ্য বইয়ের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরার

প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি। উল্লেখ্য তিনজন শ্রমিক ইট গাঁথছিলেন সে সময় একজন পথিক তারা কি করছেন জানতে চাইলেন প্রথম জন জবাব দিলেন, “দেখছেন না আমি মজুরীর জন্য কাজ করছি; দ্বিতীয় জন বললেন, “দেখছেন না আমি ইট গাঁথছি; তৃতীয় জন বললেন, “আমি এটি সুন্দর সৌধ তৈরী করছি। তিনজন এক সাথে একই কাজ করছেন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিলেন। বর্তমান লোকেরাও সেই ইট গাঁথার লোকদের মত, তৃতীয় জন ইট গাঁথার লোকটির কথা আমার মনে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি যে কথাটি বলেছিলেন সুন্দর সৌধ তৈরী করছি, কিন্তু সেই সৌধটি কি? আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের সেই সৌধটি হচ্ছে নির্বাণ। যেখানে নি-অর্থে নেই এবং বাণ-অর্থে তৃষ্ণা। অতএব নির্বাণ অর্থে তৃষ্ণা হতে পরিবিমুক্তি বা লোভ, দ্বেষ, মোহের নিবৃত্তি বুঝায়। নির্বাণ মনে করা ঠিক নয় যে, নির্বাণ একটা শূন্য বা পরিপূর্ণ অবলুপ্তি। এর যথার্থ অবস্থা আমরা পার্থিব জ্ঞানে বুঝতে অক্ষম। অন্ধলোক দেখতে পারে না বলে বলা ঠিক নয় যে, আলোর অস্তিত্ব নেই। নির্বাণ কোন স্থানে অবস্থিত নয় কিংবা কোন প্রকার স্বর্গও নয় যেখানে; একমাত্র লোকান্তর আত্মা বাস করেন। আর এক দিন যখন আমি সন্ধ্যাবেলায় বিহারের উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি থেকে যখন বেরোয়, সে সময় এক যুবককে বললাম, চলো বিহারে গিয়ে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসি, তখন যুবকটি আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন এল পঞ্চশীলের সুফল নিয়ে। উত্তরে বললাম...বাস্তবিক শীল ধর্ম রক্ষায় বহুতর সুফল আছে, শীলবান ব্যক্তি হই লোকেও পর লোকে সুখ ভোগ করে থাকেন। শীলবান ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য হয়। দীর্ঘায়ু হয়। ধনবান হন চতুর্দিকে তাহার যশকীর্তি বর্দ্ধিত হয় এবং মৃত্যুকালেও কোন প্রকার দুঃখ পান না। সংক্ষিপ্ত সময়ে সংক্ষিপ্তরূপে ব্যাখ্যা করার পর যুবকের তৃপ্তি হল না; যুবকটি আবারো পঞ্চশীলের সাফল্য রহস্য নিয়ে আমার নিকট জানতে চাইলে, জবাবে বললাম, হাতে আর সময় নেই আমাকে মাফ করুন, যদি জানতে চান পরবর্তী আরেকদিনে আমার সাথে দেখা করেন। পরদিন একই সময়ে দেখা হল সেই যুবকের সাথে সুবলং (শলক) নদীর ধারে। সামনে পার্শ্ব দিকে এগোতে লাগলাম এবং দুজনে একগলা জলে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কিছু না বলে যুবকটিকে ঘাড় ধরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলাম। যুবকটি যখন জলের উপরে মাথা তোলার যতই চেষ্টা করে ততই শক্ত হাতে ডুবিয়ে

রাখলাম। কিছুক্ষণ পর মাথাটা জলের উপরে তুলতে সুযোগ দিলাম তখন যুবকটি হাঁসফাঁস করে বুক ভরে নিশ্বাস নিল। জিজ্ঞেস করলাম যতক্ষণ জলের নিচে ছিলে তখন তুমি কি চাইছিলে? জবাবে বলল, বাতাস! এটিই হচ্ছে পঞ্চশীলের রহস্য।

তুমি যেভাবে বাতাস চাইছিলে সেভাবে যখন সাফল্য চাইবে তখন তুমি স্বর্গ কিংবা ধাপে ধাপে নির্বাণ (অবশ্যই ধ্যানের মাধ্যমে) প্রাপ্ত হতে পারবে। তখন থেকে যুবকের ইঠাৎ সদ্ধর্মভাব উপলব্ধি হল। সেজন্য কোন মহৎ কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে শুরু করতে হয় একটি জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অল্প আগুন যেমন অনেক উত্তাপ দিতে পারে না, তেমনি দুর্বল কোন ইচ্ছা শক্তি মহৎ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। বস্তুগত লাভ সৎকারের স্বার্থে বর্তমান লোকেরা প্রকৃতির বাণী মনযোগ দিয়ে শোনে না, বিহারে গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে পঞ্চশীলের নীতি পর্যন্ত বর্তমান লোকেরা উপেক্ষা করে চলে এবং বর্তমানে মূল্যবান পুণ্য সঞ্চয়ের সময়টুকু পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যায়। বর্তমান মানব সমাজের এই অস্বাভাবিক আচরণ বিশ্ব ব্যবস্থা তথা মানব জীবনে স্বর্গ কিংবা নির্বাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। যিনি প্রকৃতই সৎকারের জন্য আগ্রহী তার পক্ষে অন্য স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা অনুচিত। অন্যকে মিথ্যা বিব্রত ও প্রতারণা করে বর্তমান লোকেরা সুখের সন্ধান করে থাকেন। এটা একটা ভ্রান্ত পদ্ধতি মাত্র। অপরাদিকে মানুষ যদি সদ্ধর্মের বাণীও গৃহীত জীবনে পঞ্চশীলের নিয়ম নীতি অনুসারে জীবন-যাপন করে ন্যায় সঙ্গত ভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে শেখে তাহলে তার এই পুণ্য কর্মের প্রভাবে পরকালের জন্যই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেনই। অধিকিস্ত নিজের পূর্ণ সঞ্চয়ের শ্রদ্ধাবোধ নিজের সৎকর্ম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। একজন অসাধু ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে, চুরি বা অদত্ত গ্রহণকারী, মিথ্যাচার বা পরদারগামী, মিথ্যাবাদী এবং মাদকদ্রব্য সেবনকারী ন্যায়, একজন পেয়ারা বাগানের লোক যেমন তার পেয়ারা বাগানে পেয়ারা ফলিয়ে ছিলেন। পেয়ারা যখন খুব ছোট তখন একটা পেয়ারাকে ছোট্ট বোতলে রেখে গাছের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখলেন, পেয়ারাগুলো যখন তোলায় মত হল তখন দেখা গেল, অন্য পেয়ারাগুলো খুব বড় এবং বিভিন্ন আকৃতি হলেও বোতলের মধ্যে রাখা পেয়ারাটি বোতলের আকৃতি পেয়েছে তার বেশি নাড়তে পারেনি, সুতরাং ইহ জীবনে দুঃচরিত্র ব্যক্তির মরণের পর হীন

কুলে পুনজন্ম গ্রহণ করে। যেমন চণ্ডাল কুলে, চর্মকার কুলে, ঝারুদার কুলে, কিংবা খাওয়ার পানীয় ভোজনের অভাবী দরিদ্র কুলে, সেখানে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে সারা জীবন অতিবাহিত করতে হবে। যার ফলে সে দুবর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কুৎসিত, খর্বাকৃতি, বহু রোগা গ্রস্থ, পক্ষাঘাত গ্রস্থ ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। অধিকিস্ত ইহ জীবনে সে কায়-মনো-বাক্যে, দুঃচরিত আচরণ করে সে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। কথায় আছে-মানব জন্ম দুর্লভ যা সহজে লাভ করতে পারে না, বিজ্ঞ ব্যক্তির বলে গেছেন মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। অসৎ সঙ্গ সর্বদা ত্যাগ করে সৎ সঙ্গে ধাবিত হয়ে বুদ্ধের বাণী আচরণ করলে মহা বিভবশালী ব্রাহ্মন কিংবা মহা বিভবশালী গৃহপতি বংশে অথবা ধনাঢ্য মহাধনী, মহাভোগী, স্বর্গরোপ্য সম্পন্ন প্রভূত বিত্তোপকরণ সম্পন্ন প্রভৃতি ধনধান্য সম্পন্ন পরিবারে সুশ্রী, সুদর্শন, সুপ্রসন্ন, পরম বর্ণ সৌন্দর্য্যে বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। এবং অনু, পানীয়, বস্ত্র, যান বাহন প্রভৃতির দ্রব্য সম্ভার লাভ করেন। কায়-মনো-বাক্য, সুচরিতের অনুশীলন পূর্বক দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হন। আবার অন্যদিকে ঈর্ষা পরায়ণ ব্যক্তির কতগুলো মানুষের ধর্মীয় সাফল্যকে নজর রেখে ঠাট্টা বিদ্রুপ মনোভাব পোষণ ও নানা ধরনের বিরক্তিবোধ করে। অথচ নিজের অকুশল কর্মে সমস্যা নিয়ে তত বিরক্তিবোধ করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পাদন না করে অপরকে তার কুশল কর্ম সম্পাদন করা ব্যক্তিকে নিচে নামানোর চিন্তায় সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখে, স্বভাবগত ভাবে ঈর্ষান্বিত লোক যে কাউকে পিছন থেকে ছুরি মেরে তার পর সহানুভূতি প্রকাশ করে। এটাই হচ্ছে বর্তমান মানব ধর্ম।

তাই আসুন-বুদ্ধের সদ্ধর্মবাণী আচরণ করে অকুশল কর্ম সর্বদা ত্যাগ এবং নিজেকে পরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করি। আমরা সবাই মিলে স্বর্গের এবং অস্ত্রিমে নির্বাণের যাত্রী হই। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বনভান্তের নিকট আমি আশীর্বাদ চেয়ে প্রার্থনা করছি এবং ছোট্ট এই প্রবন্ধের দ্বারা আধুনিক ভোগবাদী অন্ধ মানব সমাজের সত্য দৃষ্টি উৎপন্ন হয়ে বিশ্ব মানবের সদ্ধর্ম উৎপত্তি হয়ে পরিত্রাণ লাভ করুক।

সাধু-সাধু-সাধু

কঠিন চীবর দানের ফল

সংগ্রহেঃ মিস্ সীমা চাকমা

ঘিলাতুলী

কঠিন চীবর বলতে ভিক্ষু সংঘকে বিশেষ সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠানে দান করা কাষায় বস্ত্র বুঝায়। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরবর্তী দিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী এই উৎসব হয়। কঠিন চীবর দানের ফল এতই বিপুল যে তা বর্ণনাভীত। এজন্য বৌদ্ধ জগতের কঠিন চীবর দানকে দানোত্তম বলা হয়। কঠিন চীবর দানের ফল সম্পর্কে কথিত আছে যে, এক সময় ভগবান বুদ্ধ তাঁর পাঁচ শত অরহৎ শিষ্যসহ হিমালয়ের অনোবতগু সরোবরের কাছে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্য নাগিত স্থবিরকে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করতে বলেন। নাগিত স্থবির অতীতে এক জন্মে কঠিন চীবর দান করে যে সব বিপুল সম্পদের ভাগী হয়েছিলেন তা তিনি ভিক্ষু সংঘের নিকট এভাবে বর্ণনা করেন-

আজ হতে ত্রিশ কল্প পূর্বে শিখি বুদ্ধের সময় আমি মনুষ্য লোকে জন্ম লাভ করেছিলাম। তখন আমি ভিক্ষু সংঘকে মহাফলদায়ী কঠিন চীবর দান দিয়ে এযাবত আর দুর্গতি ভোগ করিনি। আটার কল্পকাল দেবলোকে দিব্য সুখ ভোগ করেছি। চৌত্রিশ বার দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে দেব রাজ্য শাসন করেছি। সহস্র বার দেবরাজ্য শ্রীধারী ব্রহ্ম হয়েছি। ব্রহ্মলোক থেকে চ্যুত হলে মনুষ্য লোকে মহাধনীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি। এই মহাদানের পুণ্য প্রভাবে অনেক বার রাজ চক্রবর্তী সুখ ভোগ করেছি। যেখানে জন্মেছি সেখানে সর্ব সম্পত্তি লাভ করেছি। কোথাও আমার ধন ঐশ্বর্য্যের অভাব হয়নি। এটিই কঠিন চীবর দানের ফল। কঠিন চীবর দানের ফল এতই পুণ্যময় যে, তা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। এ দান শ্রেষ্ঠ দান। এ দানের ফলে দাতা দেবলোকে দেব ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মরূপে, মানবকুলে রাজচক্রবর্তীরূপে জন্ম লাভ করেন। জগতে যত রকম দান করা যায় তার মধ্যে কঠিন চীবর দানের ফল সবার উপরে। পর্বত প্রমাণ সোনা ও রূপা জাতীয় মহা মূল্যবান ধাতু অথবা চুরাশি হাজার চৈত্য নির্মাণ করলেও একখানা কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের এক ভাগ পুণ্য লাভ হয় না। শত বছর পর্যন্ত পাত্র চীবরাদি ভিক্ষুদের ব্যবহার্য্য অষ্ট পরিষ্কার দান করেও তার ফল কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের এক ভাগ হয় না। পৃথিবীর সকল প্রকার দানীয় বস্তু একত্রে দান করলেও একখানা কঠিন চীবর দানের

ফলে ষোল ভাগের এক ভাগ হবে না। অসংখ্য হাতি, অশ্বতরী কিংবা মনি মুক্তা বিভূষিতা কন্যা দানের দ্বারাও এই চীবর দানের ষোল ভাগের এক ভাগ পুণ্য লাভ হয় না। যেকোন স্ত্রী বা পুরুষ কঠিন চীবর দান করলে সে উত্তম দানের ফলে জন্মজন্মান্তরে স্ত্রী জন্ম প্রাপ্ত হয় না। কঠিন চীবর দানের দ্বারা ইহ জীবনের দিব্য সুখ এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ পর সুখ লাভ করা যায়। এ দানের ফলে স্রোতাপত্তি, সোকৃতাগামী, অনাগামী ইত্যাদি স্তুর অতিক্রম করে শেষ জন্মে নির্বাণ লাভ করে দুঃখের অবসান ঘটানো যায়। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ, পক্ষেক বুদ্ধ ও বুদ্ধ শিষ্য গণ সকলেই এই কঠিন চীবর দানের ফলে অমৃত পদ লাভ করেছেন। কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষুগণ পাঁচটি পাপ হতে রক্ষা পান ও পাঁচটি পুণ্যফল ভোগ করেন। এসব মহাফল জেনে সব মানুষ শ্রদ্ধা চিত্তে এ দান করুক এটিই বুদ্ধগণের উপদেশ।

সকল প্রাণী সুখী হোক দুঃখ হতে মুক্ত হোক।

সাধু-সাধু-সাধু

বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ

সংগ্রহেঃ মিস অর্পি চাক্মা

ঘিলাতলী

মানব জীবন দুর্লভ। অনেক পুণ্য প্রভাবে আমরা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি। পশু, পাখী, জীবজন্তু প্রভৃতি কত প্রাণী রয়েছে, তাদের জ্ঞান শক্তি নেই। তারা উন্নত জীবন লাভ থেকে বঞ্চিত। তাদের সংকর্ম করার ক্ষেত্রও নেই। নৈতিক জীবন গঠন করতে না পারলে সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভ করা যায় না। বুদ্ধ নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু বিনয় পিটক নয় অন্যান্য গ্রন্থে ও বুদ্ধের নৈতিক উপদেশের ভরপুর। উপদেশগুলো সংক্ষেপে হলঃ-

১। আত্ম নির্ভরশীল হও, আত্ম প্রত্যয়ী হও, আত্ম শরনই শ্রেষ্ঠ শরন।

২। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব জন্মে নয়, বংশেও নয়। কর্মের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। নদ-নদী মহা সাগরের মিলিত হয়ে তার পূর্ব নাম পরিত্যাগ করে সেরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র বুদ্ধ শাসনে পূর্ব নাম

বর্জন করে, সাধনার বলে আর্য পুরুষ নামে অভিহিত হয়।

৩। পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে নয় এবং সৎ পথে আনার উপদেশ দাও।

৪। দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করে সৎকর্ম সম্পাদন কর। কায়, বাক্য ও মন-এ ত্রিদ্বারে সংযত হও। মন থেকে সৎকর্ম ও দুষ্কর্মের ইচ্ছা শক্তি উৎপন্ন হয়। প্রসন্ন মনে কথা বললে ছায়ার ন্যায় সুখ প্রদান করে। দুষ্ট মনে কাজ করলে দুঃখ ভোগ করতে হয়।

৫। আচার অনুষ্ঠান বাহ্যিক ক্রিয়া কাণ্ড, ইন্দ্রিয় জয় ও চরিত্র বিশুদ্ধিই অন্তরদৃষ্টির মাধুর্য।

৬। কু-প্রবৃত্তিতে আবিষ্ট হলে লোভ, দ্বেষ, মোহ বৃদ্ধি পায়। এদের ধ্বংসই বিমুক্তি। তার জন্য চিন্তের একাগ্রতা সাধন কর।

৭। জীবে দয়া ও মহা মৈত্রীই বুদ্ধ দেশনার বৈশিষ্ট্য। মা তার একমাত্র ছেলেকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। সেরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করবে। এটিই মানসিক সৎ কর্ম।

৮। মিথ্যা, কথা, কুটুক্তি বৃথা বাক্য বলা থেকে বিরত হও। সত্য, প্রিয়, মিষ্ট ও অর্থপূর্ণ বাক্য বলা। এগুলো সম্যক কর্ম বাক্যের অর্ন্তগত।

৯। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা, বিষ এই পঞ্চ বানিজ্য করবে না; এগুলো মিথ্যা জীবিকা ও ধর্মের পরিপন্থী।

১০। হিংসা ত্যাগ করে সকলের প্রতি মমতা শীল হও। পরের দুঃখে দুঃখী হও। পরের সুখে সুখী হও। সুখ-দুঃখকে সমভাবে দেখ। এই চারটিই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও অপেক্ষা ভাবনা যার নাম ব্রহ্ম বিহার।

১১। মূর্খের সেবা করবে না। পণ্ডিতের সান্নিধ্যে যাবে। পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করবে।

১২। মাতা-পিতা, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করবে। সত্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে। বিবিধ শিল্প শিক্ষা করবে।

১৩। ক্ষমাশীল, গুরুর আদেশ পালনে সুবোধ্যতা, শীলগুণ সম্পন্ন ভিক্ষু শ্রমণদের দর্শন ও ধর্মালোচনা করবে।

১৪। লাভে আনন্দিত হয়োনা। লোকসানে হতাশ হয়োনা। যশে গর্ব কর না। অযশে চিন্তিত হয়োনা। নিন্দায় উত্তেজিত হবে না। প্রশংসায় উৎফুল্লও হবে না। সুখে আনন্দিত হয়োনা। দুঃখে বিচলিত হয়োনা। এরকম অবিচলিত থাকার নামই নিরাপদ অবস্থান।

১৫। যে কর্ম করে পরে অনুতাপ করতে হয়, কাজের ফল ভোগ করতে হয়, সেরূপ কর্ম না করাই উত্তম।

১৬। পাপী বন্ধু ও নিষ্কৃষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে থাকবে না। কল্যাণমিত্র ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সানিধ্যেই থাকবে।

১৭। দুষ্চরিত্র ও অসমাহিত হয়ে শত বৎসর বেঁচে থাকার চেয়ে সৎচরিত্র ও ধ্যানী ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়।

১৮। অধীনতাই দুঃখ। স্বীয় স্বাধীনতায় সুখ। সাধারণ মানুষ বহু ভাবে দুঃখ ভোগ করে। বন্ধন অতিক্রম করা বড়ই দুষ্কর।

সাদু-সাদু-সাদু

ত্রিশরণ

সুবলবসু চাকমা

শুকনাছড়ি, জুরাছড়ি

প্রথমে ত্রিলোক পূজ্য সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্মুদ্রকে নমস্কার জানিয়ে ত্রিশরণ সম্বন্ধে কিছু লেখা শুরু করছি। ভুলত্রুতির জন্য পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বৌদ্ধদের মূল মন্ত্র বা আদর্শ হচ্ছে ত্রিশরণ। ত্রিশরণ বলতে তিনটি রত্নে সমষ্টিতে বুঝায়। এগুলো হচ্ছে- বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন, ও সংঘ রত্ন। তাই এই তিন রত্নের শরণ বা গ্রহণ করা প্রত্যেক বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকাদের উচিত বা দরকার। আর ত্রিরত্ন সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা থাকা দরকার। চিরকালীন ভব চক্রে পরিভ্রমণকারী ভব দুঃখ তাপ সন্তপ্ত অসহায় সদা উৎকণ্ঠিত জনের এক মাত্র সুশীতল ছায়া সুনিবিড় চির আশ্রয় স্তল হচ্ছে ত্রিশরণ রূপ প্রশান্ত অতুলনীয়। এ বৃক্ষের অনুপম শান্তি সুখ উপভোগ করতে হলে কায়-বাক্য মনে একান্ত সশ্রদ্ধ আত্ম সমর্পণ। ক্ষণিক মোহ গ্রস্থ হয়েও বিচ্যুত হতে পারবে না। তবে এর সুফল উপলব্ধি করা সম্ভব। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন মন মানসিকতা নিয়ে ত্রিশরণাগত সত্যিকার অর্ন্তদৃষ্টি লাভ হবে না। ফলে জাগতিক ধর্ম সমূহ সন্দর্শন। এ ধর্ম সমূহ হচ্ছে অনিত্য দুঃখ অনাত্মা রূপ ত্রিলাঞ্ছন জ্ঞান বা দেখা সম্ভব বুদ্ধের নয় গুণ ধর্মের ছয় গুণ সজ্জের নয় গুণ বলা হলেও বুদ্ধ

ধর্ম ও সজ্জের গুণ অনন্ত অসীম ও অপ্রমেয়। এসব গুণাবলীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার সাথে পূজা বন্দনা করা এবং তাঁদের গুণাবলীকে স্থায়ী জীবনে প্রতিফলিত করার উপরই রয়েছে ত্রিরত্নের পূজা ও বন্দনা এবং শরণ গ্রহণ করার সার্থকতা। শুধু গতানুগতিক ভাবে ত্রিরত্নের পূজা বন্দনা ও শরণ গ্রহণে মধ্যে আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব নহে। বৌদ্ধ ধর্ম জ্ঞানীর ধর্ম। বুদ্ধ ধর্ম ও সজ্জ কি? কিভাবে ইহার পূজা বন্দনা শরণ গ্রহণ করতে হয় এবং এর দ্বারা কি ফল হয় ইত্যাদি সম্যকরূপে জানতে হবে এবং এ জানার মধ্যে রয়েছে পুণ্য। সুতরাং এ ত্রিরত্নের মধ্যে এমন একটি শক্তি নিহিত আছে যা দ্বারা সর্ব প্রকার রোগ-শোক, আপদ-বিপদ, অন্তরায়-উপদ্রপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। এমন কি মনুষ্য সম্পদ, দেব সম্পদ ব্রহ্ম সম্পদ এবং নির্বাণ সম্পদ লাভ করা যায়। জগতে ত্রিরত্নের শরণই শ্রেষ্ঠ। জন্মে দ্বারা কেহ বৌদ্ধ হয় না, কর্মের দ্বারা বৌদ্ধ হয়। এক জন প্রকৃত বৌদ্ধ হতে হলে তার অবশ্যই ত্রিরশনাপন্ন হওয়া ও পঞ্চশীল পালন করা অপরিহার্য। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলেছেন- ভয় বিহ্বল মনুষ্যগণ বন, পর্বত, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য, বা বিহার ইত্যাদি বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু এ সকল আশ্রয় নিরাপদ নহে এবং উত্তম শরণ বা আশ্রয়ও নহে। এ সকল আশ্রয় দ্বারা সর্ব ভয়, সর্ব দুঃখ হইতে মুক্তি পেতে পারে না। বরং যারা প্রকৃষ্টভাবে বুদ্ধ ধর্ম ও সজ্জের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারাই নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া থাকে। যারা দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, অতিক্রম রূপ নিরোধ ও দুঃখোপশমকারী আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই চারি আর্য্য সত্যের প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাদের পক্ষে ত্রিশরণ জ্ঞানই নিরাপদ আশ্রয় ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। জীবন অপরের ইচ্ছা শক্তি কিংবা কাহারো দয়ার উপর নির্ভরশীল নহে। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বকীয় কর্মই আপন জীবনের সুখ-দুঃখ সব কিছু নির্ভর করিয়া থাকে। তথাপি জীবনোৎকর্ম ও অগ্রগতি লক্ষ্যে কোন না কোন একটা অবলম্বন অপরিহার্য্য বিধায় সঠিক অবলম্বন এই ত্রিশরণ। যেমন বাহ্যিক ভয়ভীতি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল জীব সত্ত্বা আশ্রয় বা অবলম্বন গ্রহণ করিয়া থাকে। নিশ্চয় ঐ অবলম্বনে ভয়ভীতি ইত্যাদি হইতে রক্ষা করিবার প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। তদ্রূপভাবে অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক ভয় যথা জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন সংসার নামক বন্ধনের শিকলটি হইতে মুক্ত এবং বার বার এই দুঃখ রাশি হাত হইতে

পারিবারিকের নির্মিত এই ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করা। সংসার নামক অগ্নি কুণ্ডটির প্রখর তাপে দ্বন্দ্ব আমরা মূর্মূষ রোগীও যেমন চিকিৎসা ঔষুধ পথ্যাদিকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে চাই আমাদেরও এই ভব সংসারে দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণই জীবনোৎকর্ষ সাধন।

কিসের জন্য ত্রিশরণ গ্রহণ করি? মানুষের জীবনের সুখ শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা করাই হইতেছে যুক্তি সংগত স্বভাব। তাই মানুষ এই সুখ শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠার জন্যে যেকোন আশ্রয়ের বা অবলম্বনে শরণাপন্ন হয়। যেমন রোগ-শোকের জন্যে চিকিৎসা ও ঔষুধ পথ্যাদি চোর ডাকাত আগুনের ভয়ে নিরাপত্তা বিধান করা। বাঘের ভয়ে গভীর বনে প্রবেশ না করা। আবার যেমন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে পথিক যখন পথ চলিতে চলিতে হাঁপিয়ে উঠে সেই তখন কোন সুনিবির শীতলছায়ায় জন্যে হন্যে হইয়া বৃক্ষ বা যেকোন আশ্রয়ের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। যখন কোন বৃক্ষ বা যেকোন আশ্রয় দেখিতে পাই সে তখন তথায় স্থির নিশ্বাস নিয়ে বিশ্রাম করে। তখন সে বুঝিতে পারে পথ চলার ক্লান্তি ও প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে সেই কতো দুর্বিষহ এবং যন্ত্রনা দায়ক। অপরদিকে সুনিবির শীতলছায়া সে কত উপকারী ও কতো সুখ শান্তি প্রদায়ক তখন ইহাও সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। যতক্ষণ সেই ছায়ায় আশ্রিত থাকে ততক্ষণ সুখ ও শান্তির পরশে পরিশ্রান্ত শরীরে দুর্বিষহ যন্ত্রনা ও ক্লান্তি দূরীভূত করিতে ব্যস্ত থাকে। সেই সুবাদে পথিক ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষ বা অবলম্বনকে আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তদ্রূপ ভাবে আমরাও হাঁপিয়ে উঠা জীবন প্রবাহে একটু সুখ শান্তি পাইবার আশায় ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ এই ত্রিরত্ন নামক বৃক্ষটি ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি। মানুষ যখন সংসার নামক প্রকাণ্ড অগ্নি কুণ্ডটি প্রখর তাপে জীবন প্রবাহ নামের পথটিকে চলার ক্ষমতা হারায় তখন সে পথ চলার ক্লান্তি দুঃখ যন্ত্রণা সম্যক ভাবে বুঝিতে পারে তখনই সুদৃষ্টি সমপন্ন ব্যক্তিগণ এই ত্রিরত্ন নামক বৃক্ষের ছায়া দেখিতে পাইএবং তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের প্রত্যেক বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকাদের ত্রিশরণ সম্বন্ধে ভালো ভাবে জ্ঞান লাভ করতে হবে। আর বৌদ্ধধর্ম কে সঠিক ভাবে অনুশরণ ও অনুধাবণ করতে হবে। এর পর আমাদের বৌদ্ধ সমাজ চারিদিকে ধর্ম সম্পর্কে জাগ্রত হবে। পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমাজের কাছে আমার অনুরোধ ধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও শ্রবণ আমরা পেরণ।

পেতে পারি এবং ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করার যথার্থ সৎপথের নির্দেশ পেতে পারি। কিন্তু স্বয়ং ধর্মকে ধারণা না করলে অর্থাৎ স্বয়ং ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ না করলে শুধু ধর্ম গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ নিরর্থক। ইহা বার বার স্মরণ রাখতে হবে।

সাধু-সাধু-সাধু

আমরা কি বৌদ্ধ জাতি?

বিন্দু চাক্মা

চকপতিঘাট

আমরা চাক্মারা নিজেরদেরকে বৌদ্ধ জাতি হিসেবে বলে থাকি বা দাবি করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা আজো বৌদ্ধ জাতি পর্যায়ে কাজ করছি? প্রকৃত একজন বৌদ্ধ যার আদর্শ বৌদ্ধ জীবন, আদর্শ বৌদ্ধ সমাজ এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে কায়িক বাচনিক মানসিক সৎভাবে রক্ষা করে, আর অন্য সকল প্রাণীকেও নিজের মত করে দেখে। বর্তমান চাক্মা বৌদ্ধরা বৌদ্ধ জাতি হিসেবে দাবি করলেও কত জনে বা বুদ্ধের নীতি এবং শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রের আদেশ মেনে নিচ্ছে। এজন্য মানুষের দিন দিন দুঃখের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে। বাংলায় যাকে বলে দেওয়ালে পিঠ ঢেকে গেছে। কেহ যদি দুঃখ বা বিপদে পড়ে তখনই মূহূর্তে বুদ্ধকে এবং শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রকে স্মরণ করি বা ডাকি। কিন্তু বিপদ যখন কেটে যায় তখন বুদ্ধকে বা শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রকে স্মরণ করা দূরে থাক, মুখে নামও উচ্চারণ করি না। বুদ্ধ গৃহীদের মধ্যে পাঁচটি নীতি দিয়ে গেছেন তা পঞ্চশীল নামে অভিহিত। পঞ্চশীল সম্পর্কে আমরা কেহ না কেউ কমবেশী জানি। যেমন- প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকা, চুরি হতে বিরত থাকা, ব্যভিচার (মিথ্যা কামাচার) হতে বিরত থাকা, মিথ্যা ভাষন হতে বিরত থাকা, এবং সুরা জাতীয় প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকা। কিন্তু এই সব জেনেও আমরা পঞ্চশীলকে যথাযথ ভাবে পালন করি না; রক্ষা করি না। তাই বর্তমান চাক্মা বৌদ্ধদের পাপের বোঝা এত বেশী হয়েছে মূহূর্তে মানুষের দুঃখে পরিণত হচ্ছে। যেমন একটি পুকুরে বৃষ্টি পড়তে থাকলে পুকুরটি ভরে যাবে। তেমনি আমাদের পাপের এবং অকুশলের পুকুরটি প্রতিনিয়ত ভরে যাচ্ছে। এসব না জানা, না বুঝা বৌদ্ধ পারিভাষিক ভাষায় অবিদ্যা নামে বলা হয়েছে। যতদিন আমরা এই অবিদ্যা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে

আমাদের না পারবো ততদিন সুখ নামক বিষয়টি সোনার হরিণের পিছনে দৌড়ানো মাত্র। এমন ভয়ংকর কর্ম আছে স্বয়ং বুদ্ধকে পর্যন্ত ভোগ করতে চায়োঁতল। যা শুনলে শরীর শিউরে উঠে। বর্তমান মানুষেরা এসব কর্ম নিশ্বাস করে না। কর্ম এবং কর্মের ফল আছে বিধায় পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে- কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুশ্রী, কেহ শিশ্রী ইত্যাদি ভাবে জন্ম ধারণ করেছে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, নিজ নিজ কর্মানুযায়ী জীবগণ জন্ম গ্রহণ করেছে। এতে কারোর হাত নেই এবং ভগবানেরও সৃষ্ট নয়। যদি ভগবানের সৃষ্ট হতো তাহলে জীবগণের মধ্যে ভেদাভেদ বা তারতম্য থাকতো না। কারণ- ভগবান সকল জীবের প্রতি সমভাবে মৈত্রী এবং মঙ্গল কামনা করেন। বই পড়ে জানা যায় যে জাতীতে একজন মহা পুরুষ বা অরহৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে সে জাতি কখনো নিম্নমুখী হয় না। কিন্তু আসলে বাস্তবে বর্তমান সমাজে চাক্মা বৌদ্ধরা কি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি? এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় বনভান্তে উপমা দিয়ে বললেন-ধরো, আমি এক জন ডাক্তার, তোমাদের প্রচণ্ডভাবে পেট ব্যথা করছে, তাই পেট ব্যথার ঔষধ দিলাম খাওয়ার জন্য। কিন্তু তোমরা ডাক্তারের কথানুযায়ী না চলে ঔষধ না খেয়ে এমনি সামনে ফেলে রেখেছ, এতে তোমাদের পেট ব্যথা কমছে না, বরং বেড়ে চলেছে। তখন ডাক্তারের দোষ, নাকি রোগীর দোষ? এখানে দেখা যাচ্ছে রোগীর দোষ। কারণ ডাক্তারতো ঔষধ দিয়েছেন নিয়মিত খাওয়ার জন্য। ঠিক তদ্রূপ বর্তমান চাক্মা বৌদ্ধদের সমাজে এরকম চলছে। অথচ শ্রদ্ধেয় বনভান্তে কত কষ্ট সহ্য করে নিজের জাতিকে ভালোবেসে স্নেহ দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার নির্দেশ দিচ্ছেন। তবুও আমরা সেই নির্দেশ প্রতিনিয়ত উপেক্ষা করে চলেছি। একজন অরহতের পরিবর্তে একশত জন অরহত উৎপন্ন হলেও আমরা নিচু হয়ে থাকবো যদি না বুদ্ধের বা শ্রদ্ধেয় বনভান্তের আদেশ উপদেশ মেনে না চলি এবং আদর্শ বৌদ্ধ জীবন, আদর্শ বৌদ্ধ সমাজ গড়ে না তোলা পর্যন্ত। বুদ্ধ বলেছেন-মানব জীবন দুর্লভ, এক বার যদি ভুলক্রমে হারিয়ে ফেলি তাহলে আর মানব জীবন লাভ করতে বড়ই দুষ্কর হয়ে পড়বে। আজকের যেকোন জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানো নারীদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। কিন্তু এর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তার চেয়ে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যুব সমাজ এখনো পিছে পড়ে আছে এবং ধর্মে কর্মেও অনীহা। কিন্তু এমনটি হওয়া

কথা নয়। যুব সমাজ যদি ধর্মে কর্মে উদাসীনতা দেখায় তাহলে নিশ্চিত ভবিষ্যত বংশধর এর চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে যাবে। কারণ-যুবরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তারাই পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই সবাইকে আমার অনুরোধ- শুধুমাত্র শ্রদ্ধেয় বনভান্তের এবং ভিক্ষু সংঘের সামনে মুখে অঙ্গীকার না করে বরং বাস্তব জীবনে বুদ্ধে নীতি আদর্শ মেনে চলে এই দুর্লভ মানব জন্মকে সার্থক করে গড়ে তুলি এবং একতাবদ্ধ হয়ে পুণ্য কাজে লিপ্ত থাকি। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথীতে উপোসথ শীল পালন করি। অনাগত ভবিষ্যতে যাতে আর্যমিত্র বুদ্ধকে সাক্ষাৎ পেয়ে আমরা সবাই মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুঃখ মুক্তি নির্বাণ লাভ করতে পারি। পরিশেষে- আমার প্রবন্ধটি ২০০৫ইং দানোত্তম কঠিন চীবর দানে উৎসর্গ হউক। কামনা এবং প্রার্থনা জানাই দানোত্তম কঠিন চীবর দান যাতে সুস্থভাবে অন্তরায়, উপদ্রব বিহীন হয়ে নিরাপদে উৎযাপন হউক এই প্রত্যাশায়।

সাধু-সাধু-সাধু

মারের পক্ষাবলম্বী না হয়ে বুদ্ধের পক্ষাবলম্বী হও। (বনভান্তে)

জীবনের সার্থকতা

তরুন জ্যোতি চাকমা

সামিরা পাড়া

মানব জন্ম দুর্লভ জন্ম। যার কারণ মানুষ ভালো-মন্দ, দোষ গুণ, ইত্যাদি উপলব্ধি করার মত শক্তিও সার্বথ্য একমাত্র মানুষেরই রয়েছে। তাই মানব জীবনকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়। তার কারণ মানুষের রয়েছে হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধি এবং বিবেক। এইগুলো থেকেই মানুষের নীতি জ্ঞান, পরের উপকার ভালো-মন্দ, বিবেক করার ক্ষমতা উৎপত্তি হয়। সুতরাং যে মানুষের মধ্যে এই গুণগুলো যতটুকু পরিপূর্ণ এবং প্রবল সেই মানুষ ব্যক্তি হিসাবে ততটুকু পরিপূর্ণ ও সার্থক। কিন্তু ধর্ম ছাড়া এই গুণগুলো উপলব্ধি, করা বা বিকাশ ঘটানো কখনো সম্ভব নয়। ধর্ম দ্বারা মানুষ নিজেই নিজের উপর নির্ভরশীল হয়ে তার হৃদয়ের স্বরূপ এবং প্রকৃত ভালো-মন্দকে অনুভব করতে পারে। ধর্ম মানুষকে আত্ম বিশ্বাস, সাহজ ও শক্তি দেয়।

ধর্ম মনের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার কালিমাকে দূরীভূত করে মনকে ঝকঝকে আয়নার মত পরিষ্কার করে দেয়। যার ফল স্বরূপ সহজে সত্যেই অসত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়-ধর্ম মানুষকে অসংখ্য চোখ দেয়, সেই চোখ দেখার চোখ, বুঝার চোখ, অনুভূতির চোখ; অপর পক্ষে ধর্মের সাথে যে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, সেই জীবন অন্ধ এবং বৃথা। ধর্মহীন মানুষ লক্ষকোটি ধনের মধ্যে বাস করলেও তারা নিজেকে নিজে উপলব্ধি করতে পারে না। বিশ্ব জগত, বস্তু জগত, এমন কি নিজের মনোজগত সম্বন্ধে ও তাদের কোন ধারণা থাকে না। এই সংসার সমুদ্রে ধর্মের বা জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে এবং ধর্ম ও জ্ঞান দ্বারা মানব জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করা যায়। তবে ধর্মের সাথে যে জীবনের বা জ্ঞানের বাস্তব সম্পর্ক নেই তা ফলপ্রসূ বা সার্থকতাও নেই। মানব জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলার এক মাত্র মাধ্যম হল ধর্মের মাধ্যম। ধর্মের দ্বারা অসাধু মানুষ সাধু হয়, অজ্ঞানী মানুষ জ্ঞানী হয়, মূর্খ মানুষ পণ্ডিত হয় এমন কি চোর ডাকাত সন্ত্রাসীরাও ভালো মানুষ হয় তার জলন্ত প্রমাণ অঙ্গুলিমাল। অঙ্গুলিমাল ৯৯৯ (নয়শত নিরানব্বই) নরনারী হত্যা করেও কেন সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি হয়েছিলেন একমাত্র ধর্মের মাধ্যমে। ভগবান বুদ্ধের নীতি আদর্শ অনুসরণ করে। আমরাও যদি দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে ভগবান বুদ্ধে নীতি আদর্শ অনুসরণ করে যার যার শক্তি সার্মথ্য অনুসারে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে পালন করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক ও সুন্দর হবে।

সুধু-সাধু-সাধু

মানব সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

মিস্ বাবলী চাক্মা

চকপতি ঘাট

রাজ কুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে রাজ্যপট ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর “একলা চলো” নীতি অবলম্বন করেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর যাবত ধ্যান করে ৩৫ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তার দেওয়া নীতি যারা মেনে চলেন তারাই বৌদ্ধ। আমাদের মানব সমাজের বাস্তব জীবনে বুদ্ধের নীতি কত টুকু অনুসরণ করি সেটাই প্রশ্নের বিষয়। এক জন মানুষ যখন এই সুন্দর পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে মানব সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুধাবন করার

বিবেক লাভ করে ঠিক তখনি ধর্মের নীতি অবলম্বন করে। ধর্মের দ্বারা একজন মানুষ হানাহানি, হিংসা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি অকুশল কর্ম থেকে মুক্ত থাকে। ভগবান বুদ্ধে আমলেও বিভিন্ন অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়ন ছিল। কিন্তু বুদ্ধে অমৃতময় আদর্শে সব পাপ কর্ম ধ্বংস হয়ে নতুন একটি পৃথিবী জন্ম হয়েছিল। তার একটি উদাহরণ- “অঙ্গুলিমাল”। তিনি ৯৯৯ (নয়শত নিরানব্বই) জন জীবিত মানুষ হত্যা করেও ভগবান বুদ্ধের আদর্শে সেই পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমরা তৎকালীন বিশাখার কথা বা আদর্শ অনুসরণ করলে দেখতে পাই, কতো কষ্ট করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সূতা এবং সূতা থেকে চীবর তৈরী করে মহা ভিক্ষু সংঘকে দান করেছিলেন। এরকম নজির আমরা কোথাও দেখতে পাই না। তাই তাঁর নীতি অবলম্বন করে আজকের এই মহা কঠিন চীবর দান। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এই কঠিন চীবর দানই শ্রেষ্ঠ দান বলে বুদ্ধ বলেছেন। এই দান কার্যটি বছরে একবারই অনুষ্ঠিত হয়। বাস্তব জীবনে আমরা ধর্মের নীতি, আদর্শ কতটা পালন করি। চাক্কা, মারমা, বড়ুয়া, তঞ্চঙ্গ্যা এই চার জাতি আমরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারীরা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কত টুকু উপলব্ধি করতে পারি? ধর্ম অর্থ যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে লোকত্তর চারি মার্গ, চারি ফলও নির্বাণ এই নয় প্রকার ধর্মকে খুঁজে পাই। এ ক্ষেত্রে মেনে চলা বা বিশ্বাস হলো প্রধান বিষয়। বর্তমান শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভাঙে) তাঁর সম্মুখে যদি আমরা প্রফুল চিত্তে সমবেত হই, তবে বৌদ্ধ ধর্মের সত্যতা প্রকাশ পাই। তিনি কঠোর ধ্যান সাধনার পর এখন প্রতিটি প্রাণীর সুখ ও কল্যাণের জন্য বেঁচে আছেন। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই মঙ্গল জনক। তাঁর আদর্শে যে ব্যক্তি বসবাস করে সেই ব্যক্তি বসবাস শুভ হয়। তৎকালীন ভগবান বুদ্ধের পরিবর্তে বর্তমান বনভাঙের আদর্শ অবলোকন করাই মহৎ ও কল্যাণ জনক কর্ম। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যদি ধর্মের আদর্শে গড়ে উঠি তবে আজকে এই হিংসা হানাহানি চিরতরে মোছন হয়ে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় গড়ে উঠবে, আমাদের প্রতিটি মানব জাতি। কারণ স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- তাঁর আদর্শ পালন একটি জীবনের হিতকর, সুখকর ও কল্যাণজনক এবং ধর্মের নীতিসমূহ পালন করা মানব জীবনের এক মাত্র সার্থকতা।

সাধু-সাধু-সাধু

আমার মহাকাল থেকে রক্ষা কবচ শ্রদ্ধেয় বনভাণ্ডে

মিসেস্ রাজুলতা চাক্মা
পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা
বনযোগীছড়া

সেই দিন ১১ই নভেম্বর ১৯৮৬ইং রোজ মঙ্গলবার। আমি ও আমার মা সহ রাজবন বিহারে যাই। ভাণ্ডে, আমাদেরকে দেখে বললেন, “সুবলং বাসী আসতেছে।” আমি বললাম, ভাণ্ডে! আমরা সুবলং বাসী নই, আমরা গোলাছড়ি বাসী। গোলাছড়ি থেকে এসেছি। আমি সুবলং জুরাছড়িতে চাকরি করি। ভাণ্ডে বললেন, “তুমি কার মেয়ে? কার বউ?” আমি উত্তরে বললাম আমি শরৎ কুমারের মেয়ে। দীঘিনালার অস্থিনী কুমারের ছেলের বউ। এই বলে আমি ও আমার মা, দু’জনে তাড়াতাড়ি বুদ্ধ বন্দনা করে ভাণ্ডের সামনে বসে পড়লাম। বললাম- ভাণ্ডে, আমরা কিছু দানীয় সামগ্রী এনেছি, এইগুলো আপনাকে দিতে পারবো কি? তখন ভাণ্ডে বললেন- “সেগুলো কি?” আমি বললাম, গ্যাকোটাস সাবান, কালো মাজন, ওভালটিন ও তাল মিছরী। তখন ভাণ্ডে বললেন, “পারবে, পারবে”। তিনি বললেন, ‘জ্ঞানীরা বুঝে-সুঝে নিয়ে আসে। অজ্ঞানীরা আন্দাজে নিয়ে আসে। তখন আমার মা ও আমি দানীয় সামগ্রীগুলো ভাণ্ডের হাতে তুলে দিলাম। ভাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন, “ও কে?” আমি বললাম, আমার মা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার বাবা, মা, তাহলে এখানো বেঁচে আছে?” বললাম হাঁ ভাণ্ডে। ভাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন- “নির্মল মাষ্টারের মেয়ে ‘কমনিকাকে চেন?” বললাম, হাঁ ভাণ্ডে চিনি। আমরা দু’জনে একই বিভাগে চাকরী করি। ভাণ্ডে বললেন, তুমি বড়? নাকি সে বড়। “আমি বললাম- হিসাব করতে গেলে তার চেয়ে আমি একটু বড়। ভাণ্ডে আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি যে পদে নিয়োজিত আছ, সেই পদে কত জন লোকের প্রয়োজন?” আমি উত্তরে বললাম, চার জন থাকার প্রয়োজন। কিন্তু আছি মাত্র আমি এক জন। সহকারী বার (১২) জন থাকা প্রয়োজন। তারা আছে নয় (৯) জন। ভাণ্ডে, জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কাজ কি?” বললাম, আমার কাজ হলো সপ্তাহে দুই দিন ফিল্ডে কাজ করা, আর বাকী দিনগুলো অফিসে কাজ করা। ভাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি সমগ্র সুবলং ঘুরতে হয়?” উত্তরে বললাম, হিসাব করতে গেলে সবটাই ঘুরতে হয়। ভাণ্ডে বললেন, “তা’হলে তো তোমার দায়িত্ব অনেক বেশী।” তিনি

সেই কথা কি তুমি লোকের সামনে বলবে? বললাম মিথ্যা কথা না বললে যে, আমার উপায় নেই। চাকরীতো রক্ষা করতে হবে। তবুও ভাত্তের সামনে বললাম, ভাত্তে আমি আর পাপের কাজও করবো না। মিথ্যা কথাও বলবো না। এবারে আমাকে বাসায় যেতে বললেন। যখন বাসায় ফিরলাম, তখন মা আমার জন্য চিন্তায় অস্থির। মা আমাকে বললেন, তুই কি করে চাকরী করবি। মাকে সান্তনা দিয়ে বললাম, চিন্তা করে লাভ নেই। কারণ আমিতো ভাত্তের মত মহা পুরুষ হতে পারবো না। আমাদেরতো বাঁচতে হবে। কয়েক দিন পর আবার বিহারে গেলাম, তখন ভাত্তে, তোমার জন্য চাকরীটা যোগ্য নই। আমি বললাম, আমি আর সেই পাপের কাজ করি না, করবো না। এভাবে প্রথম বার, দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, চতুর্থ বার যাওয়ার পর শ্রদ্ধেয় ভাত্তে বললেন- স্বামী না থাকলে তিনটি বিষয়ে সুখে থাকতে পারে। (১) সতীনের জ্বালা পাওয়া যায় না। (২) স্বামী না থাকলে গর্ভবতী হওয়া যায় না। (৩) যা ইচ্ছা তা করতে পারে। পঞ্চমবারে যাওয়ার পরে আরো দুইটা বিষয়ে কথা বললেন, জ্ঞান ও সত্য নিয়ে থাকলে সুখ লাভ হয় ও নির্বাণগামী হওয়া যায়। তাই আমি বলি শ্রদ্ধেয় বনভাত্তেকে যদি সাক্ষাৎ না পেতাম তাহলে অবশ্যই আমি নরকগামী হতাম। কাজেই আমি রক্ষা পেয়েছি, আমি মুক্ত হয়েছি, আমি আচ্ছাদিত, বস্ত্র ফেরত পেয়েছি।

সাধু- সাধু-সাধু

ধর্মের প্রতি আমার যেটুকু মূল্যায়ন

মিস্ রূপালী চাকমা

হাজাছড়া, বরকল

যুগ-যুগান্তরে অগণিত হাজার কালের অনুসারী সকল ধর্মের মধ্যে অন্যতম আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্ম সে যে বিশাল.....সমুদ্র বাহিত করার প্রবন্ধ নয় বরং পৃথিবীর সাইতে অসীম সীমানায় লক্ষ্যস্থানের পথ খুঁজে চলা। যে পথে নেই কোন জন্ম-জন্মান্তরের নিয়ম এবং এই নরাধর্মের দুনিয়ার কোন প্রাকৃতিক পদ্ধতি। বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে মৌলিক ধর্ম আর বুদ্ধ মানে বুঝায়- জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, এবং লোভ, দ্বেষ, মোহ সব কিছুকে নিরোধ করে যিনি পরম নির্বাণমুখী হয়েছিলেন তিনিই বুদ্ধ। তথাগত বুদ্ধ জাগতিক দুঃখ-দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়, সম্যক উপলব্ধি করে সর্ব দুঃখের কবল হতে অব্যাহতির জন্য যে সকল মার্গ প্রদর্শন করেছেন সে সব বাস্তবিক মুক্তির জন্য চিহ্নিত করার নিদান্ত প্রয়োজনীয়। বুদ্ধ বলেছেন-সততাই ধর্ম, বিষমতা অধর্ম, সততা অনাসক্তি এবং বিষমতা আসক্তি। যেখানে আসক্তি সেখানে দুঃখ আর যেখানে অনাসক্তি সেখানে পরম সুখ, পরম শান্তি। অন্যথায় বিদর্শন সাধনার দ্বারা আমরা দেখি যে, শরীরের প্রবাহিত এই চিত্তধারাতে বিবিধ কারণে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই প্রকট হয়ে থাকে। সুখ নামের সংবেদনা আমাদের খুব প্রিয় লাগে কাজেই তার প্রতি আমাদের অনুরাগ উৎপন্ন হয়, পরিণামে তাকে ধরে রাখতে আমরা তৎপর হই। আসলে সেই সুখ নামক সংবেদনটুকু যে, খুব তাড়াতে হারিয়ে যায় সেজন্য আমরা আতংকিত। সব কিছু যেন প্রকৃতির পরিবর্তনশীল নিয়মের সাথে তাল মিলিয়ে সবার শরীরে শুধু এক ছোঁয়া সুখ লাগা মাত্র। দুঃখতাই সবার জীবনে গড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার সেই দুঃখটা যখন সংবেদনা হয় তখন তার প্রতি জেগে উঠে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ সে বুঝি কখনও দূর হবে না? এই চিন্তায়, এই ভয়ে আমরা শুধু নিরাশ হই। অতএব, আমাদের মানব জীবন সুখ-দুঃখ উভয়ই বৈষম্য। শান্তি এবং স্বস্তি কে না চাই? যেহেতু সমগ্র জগৎ অশান্তি, সাথে মানুষও চঞ্চল, ক্রোধ, লোভ, এবং ঈর্ষাপরায়ণ-এজাতীয় নেশায় আসক্ত, সেখানে মানুষ স্বস্তি পাবে কই? পরিণামের জন্য যেটুকু চাঁরত্র আমাদের অর্জন করা উচিত সেখানে কেন আমাদের বৌদ্ধ জাতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত। আজকাল দেখা যায় প্রায় সকল মানুষই সম্প্রদায় ধর্মে দীক্ষিত। আমাদের

সংগুনাবলী বৈশিষ্ট্য এবং সত্য ধর্মের আলো ছড়াতে হবে। জানতে হবে। পাপ মানুষকে কি পথে চলতে দেয়। পাপ মানুষকে অন্ধকার করে এবং অমুক্তির স্থানে ঠেলে দেয়। সকল মানুষ লোভ, দ্বেষ, মোহতে জর্জরিত এরূপ পাপ কর্ম তৃষ্ণাগুলো যতদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হবে না ততদিনের এই অন্ধকার মুক্তির অবাস্তব কল্পনায় বিমোহিত। আমাদের এই মানব জাতিকে কঠিন জীবনে জন্ম-ধারণ করা হলেও দুঃখকে নিবারণ করার মত সহজ সরল বিধি আমাদের রয়েছে। তাই যাদ্বারা আমাদের নিজস্ব অর্ন্তমনকে ধুয়ে সত্য ধর্মের পবিত্রতাকে ধারণ করা প্রয়োজন সে সব নীতি কার্য আদর্শগুলো সদ্যবহার করা সকল মানুষের অবশ্যই প্রয়োজন। মানুষকে জাগতিক পথে চলতে হবে এবং এই পথে চলতে গিয়ে এটা কখনও অনিবার্য নয় যে, কেউ নিজেই নিজেকে বুদ্ধের সমতুল্য জ্ঞানে পতিত হবেন। বৌদ্ধ কিংবা বুদ্ধ জাতিকে আমরা স্বীকার করি বা না করি যে দিন-আমরা সেই মহাকাব্যিক তথাগত ভগবান বুদ্ধে দ্বারা প্রদর্শিত সহজ-সরল পন্থাকে নিজস্ব করে অকুশল চিন্তকে দূর করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষতি হবে না। পৃথিবীতে কেউ অধর্মের মানুষ নয়, সকল মানব জাতিই এক-একটি ধর্মে দীক্ষিত। প্রবন্ধের প্রথম বারের মত আবারও উল্লেখ করতে হয়-সকল ধর্মের চেয়ে আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম দুঃখ মুক্তি নির্বাণে উপনীত হওয়া অত্যন্ত সহায়ক। অবশ্য বলতে হবে-অন্যান্য ধর্মও অমানবিক নয়। তাই মানবতার এই যথার্থ মানদণ্ডগুলো নিজেকে মাপতে থাকুন এবং যখন নিজের শীল-সমাধি আর প্রজ্ঞার দুর্বলতা দেখা দিয়ে থাকে তখন সমস্ত তৃষ্ণার অহংকারকে দূর করে সত্যধর্মে অনন্ত মৈত্রী কল্যাণ সাধন করতে চেষ্টা করতে হবে, এতেই আমাদের মঙ্গল হবে। সদ্ধর্মের এই সার্বজনীন, সার্বদেশীক, সার্বকালীক, এবং সার্বাহিতকারী স্বরূপ অধিক থেকে অধিক মাত্রায় সকল বৌদ্ধ জাতি অগ্রগামী হোক এবং সকল মানব জাতির হিত সুখ কামনা করে সকল প্রাণী, সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হোক।

সাধু- সাধু-সাধু

জন্ম মৃত্যু রহস্য

মিস্ বিশাখা চাক্‌মা

রাস্তা মাথা

এ পৃথিবীতে মানুষ-জীবজন্তু প্রাণী জগতের সকল প্রাণী ঐরামহীনভাবে জন্ম হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব জীব জগতের প্রাণীর জন্ম মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা নেই। কেউ জন্ম হয়েই অকালে মরে যাচ্ছে, আবার কেউ হয়তো দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে পরিশেষে বার্ধক্য জনিত কারণে অথবা দীর্ঘকাল অকাল ব্যাধি বা রোগ ভোগের পর অশেষ দুঃখ যন্ত্রনা ভোগে অবশেষে মৃত্যু হচ্ছে। জন্ম-মৃত্যুর এই রহস্য আমরা কোন ভাবে অধিগত হতে পারি না জন্ম-মৃত্যুর এ রহস্যকে আমরা বা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী যে কোন ব্যক্তির সুখ-দুঃখ যন্ত্রনা কাতর এই মৃত্যুকে সান্তনা সূচক বা বেদনা সূচক বাক্যে সচরাচর বলে থাকি-আহা! অমুক বেচারী, অনেক দুঃখ ভোগের পর তার মৃত্যু হলো, যাহোক মরে গিয়েই এবার বেঁচে গেল, দুঃখ থেকে মুক্তি পেল। আবার সদ্য একজন নব-জাতক জন্ম হলো, তাতে কত আনন্দ-উল্লাস, মনের প্রশান্তি তা সীমা থাকে না। বুদ্ধের ধর্ম দর্শন অনুসারে এই ধরনের উক্তি বা মন্তব্য করা বিধেয় নহে। এসব মন্তব্য ক্ষণিকের সুখ-দুঃখের প্রলেপ মাত্র। এই প্রসঙ্গে একদিন শ্রদ্ধেয় বনভাঙে দেশনায় বলেছেন-তোমরা বলে থাক যে, অমুক মরে গিয়েই বেঁচে গেছে' আসলে কিন্তু তা সঠিক নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যা। মরে গিয়ে তার দুঃখ শেষ হয়ে যায়নি। মৃত্যুর পর সে কোথায় জন্ম হয়েছে তা তোমরা দেখেছ, মৃত্যুর পর সে যদি গরু, ছাগল, কুকুর, এবং পাখি জন্ম হয়, তাহলে সে কি আর সহজে মুক্ত হবে? এ জন্মে মনুষ্য হয়ে জন্ম লাভ করে অশেষ দুঃখ ভোগ করে মৃত্যু হয়েছে, পরের জন্মে সে মনুষ্য লাভ হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়। তাহলে মনুষ্য জন্ম না হয়ে যদি পশু কূলে জন্ম লাভ করে থাকে, সে কি সহজে দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে? জ্ঞান হীন পশু কূলে জন্ম হয়ে তা সহজেই দুঃখ মুক্তি সম্ভব হবার নয়। এভাবে জন্ম-মৃত্যুর অন্তরালে লুকায়িত গভীর রহস্য নিহিত থাকায় তার সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হলে সীমাহীন ভাবে। এজন্য জন্ম-মৃত্যুর রহস্য মানুষের কার কর্মের মধ্যেও সীমাবদ্ধ বলে ধর্মীয় বিশ্বাস। সাধারণত একজন মানুষের মধ্যে ভাগ্য মন্দ, সুখ-দুঃখ ও বিচার-বিবেক বিশেষণ করার এবং বুঝার মতো উপলব্ধি

বিদ্যমান থাকে। কিন্তু একজন হীন প্রাণীর মনে সে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলতে কিছুই থাকে না, সেজন্য প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন-মানব জীবন বড়ই দুর্লভ। কত জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ও পুণ্য বলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি চিন্তা ভাবনায় সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণী। যুগে যুগে মহাপুরুষের জন্ম গ্রহণ, জগতের মহাপুরুষের আবির্ভাব না ঘটলে যেমন কোন মানুষ সঠিক পত্তা না পেলে মুক্তি লাভ সম্ভব হয় না, তেমনি মনুষ্য জন্ম না হলে কোন পুণ্য-কর্ম সম্পাদন করতে না পারলে কোন মানুষের পক্ষে মুক্তি লাভ সহজে হয় না। বুদ্ধ বলেছেন-জগতে বুদ্ধ আবির্ভাব বড়ই দুর্লভ, বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করা বড়ই দুর্লভ। দুর্লভ মানব জীবন লাভ করে জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য সঞ্চয় না থাকলে বুদ্ধের সাক্ষাত যেমন দুরূহ, তেমনি মুক্ত পুরুষ সাক্ষাতে পুণ্য কর্ম সম্পাদন, ধর্ম শ্রবণ না করলে দুঃখ মুক্তি লাভ মানুষের পক্ষে সহজেই হয় না। মানুষ বা প্রাণীর ভৌতিক দেহ ধর্ম মতে পঞ্চস্কন্ধ নামে অবহিত যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা পঞ্চস্কন্ধই একজন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে চালিত করে বা চালিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়-অথবা বাধ্য করে এবং এই পঞ্চস্কন্ধই মানুষের ইন্দ্রিয়েই ক্ষুধা নিবৃত্তির উপাদানকে সহজে পাওয়ার সাহায্য করে। মানুষের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (যথা- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক) ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অবিদ্যা বা অবিদ্যাজনিত অজ্ঞান তা, কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা ইত্যাদি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার তৃষ্ণা মানুষকে সব সময় উত্তেজিত হয়ে উজ্জীবিত করে জর্জরিত করে অশেষ দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করতে বাধ্য করে। চক্ষু ইন্দ্রিয় রূপ-প্রীতি, অপরূপ সৌন্দর্য দেখায়, কর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুমধুর কণ্ঠ ও শব্দের লহরী শ্রবণ করায়, নাসিকা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুভাষিত সুঘ্রাণ, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুস্বাদু রসানুভূতি এবং ত্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোমল স্পর্শজনিত সুখানুভূতির ফল মানুষের অন্তরস্থিত সহগত রিপুকে উদ্বেলিত ও উত্তেজিত করে মানুষের মনকে সদা তাড়িত ও পীড়িত করে। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের মূল কথা হলো-অবিদ্যা বা অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানতাহেতু তৃষ্ণার উৎপত্তি, তৃষ্ণা হতে কর্মের উৎপত্তি। সত্ত্বগনের নিজ নিজ কর্মের বিপাকানুযায়ী এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্ম- মৃত্যু হয়ে অনন্ত দুঃখের ফলাদি ভোগ করছে। অবিদ্যা তৃষ্ণা, জীবন ও অঙ্গ” ধ্বংস হলেই সর্ব দুঃখ বিনাশহেতু দুঃখ মুক্তি নির্বাণ, লাভ হয় বলে বুদ্ধ বলেছেন। এই

ধারাবাহিকতায় শ্রদ্ধেয় আৰ্য্য পুরুষ বনভাস্ত্রে একদিন দেশনায় বলেছেন-
তোমরা আমি কি চৰ্ম চক্ষুতে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না। জ্ঞান
চক্ষু উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেই জ্ঞান চক্ষু উৎপন্নের জন্য সচেত্ব
হও। আমি দীৰ্ঘ দিন যাবত জীবন বাজি রেখে কঠোর ধ্যান সাধনা
করেছি। অনিদ্রায় ও অনাহারে কাটিয়েছি, অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছি
এবং বজ্র কঠোর সাধনায় আমি অবিদ্যা-তৃষ্ণা-জীবন-অঙ্গ” ত্যাগ করেছি।
আমরা সৰ্ব আসব ক্ষয় হয়েছে, আমি স্বাধীন মুক্ত, মুক্তি পথ আমার হস্ত
গত তাই আমি নির্বাণ পথের মুক্ত অভিযাত্রী। চাক্ষুষ জীবিত বুদ্ধ” পরম
পূজনীয় আৰ্য্য পুরুষ সাধনানন্দ মহাস্থবিন (বনভাস্ত্রে) মহোদয়কে আমরা
সম্মুখ সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি একদিন বৈকালিক দেশনায় বলেছেন-আমি
তোমাদেরকে দেখি, তোমরা কে, কি করতেছ। এতে আমি আমার
সাধারণ জ্ঞানে ধরে নিতে পারি শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রে শুধু নির্বাণ পথের মুক্ত
পথিক নন, তিনি বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞানের অধিকারী, পূর্ব নিবাস ও জাতিস্বর
অধিকারী, তিনি বিভিন্ন ভাষায় কথার অর্থ বুঝার অধিকারী। এক কথায়
তিনি ষড়বিজ্ঞা অর্হৎ” নির্বাণ অধিগত স্বাধীন মুক্ত মহামানব।

সাধু- সাধু- সাধু

অভাগা সোহাগ

সংগ্রহেঃ

মিস্ মনোনিতা চাক্‌মা

শুকনাছড়ি

এক দরিদ্র পরিবারে সোহাগ নামে এক বালক ছিল। সোহাগের বয়স
যখন সাত বছর তখন তার বাবা মারা যায়। তার বাবা মারা যাবার পর
তার মা আরেক ব্যক্তিকে বিবাহ করে। লোকটি ছিল পাপী, হিংস্র এবং
নির্দয়। সে তার ছেলেকে সব সময় মারধর করত, গালি দিত। ছেলেটির
সং পিতা সব সময় মনে করত এই ছেলেটি আমার একটি অকর্মণ্য
বোঝা। আমি এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব। কিন্তু আমি তাকে কিছু
করতে পারি না। কারণ তার মা তাকে খুব ভালবাসে। তার প্রাণের চেয়েও
বেশি ভালবাসে। আমি এখন তাকে কি করব? সে মনে মনে ভাবতে
লাগল, কি ভাবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। এক দিন তার সং পিতা
বুদ্ধি করে সোহাগকে ডেকে বলল-খোকা আমার সোনার মালায় তোমাকে

আমার বুকে এসো। আমি আর তোমাকে মারধর করবো না। এসো। আমার কাছে এসো। সোহাগের সৎপিতা সোহাগকে বলল-এসো সোহাগ। আমরা বেড়াতে যায়। ছেলেটি সৎপিতার কথা শুনে অভাগ হয়ে গেল। কারণ তার সৎপিতা তার সাথে মধুর কণ্ঠে কথা বলছেন। কিন্তু এভাবে তো কোন দিন আমার সাথে কথা বলেন না। এত মধুর কণ্ঠে ডাকছেন কেন? কিন্তু ছেলেটি মনে মনে ভাবতে লাগল নিশ্চয় আমার পিতা ভাল হয়ে গেছেন। এই ভেবে সে তার সৎপিতার সাথে বেড়াতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তার সৎপিতা তাকে বেড়াতে নিয়ে গেল। তার সৎপিতা ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে কোন মানুষ থাকে না। অন্ধকার হলে বাঘ-শিয়ালের গর্জন শোনা যায়। সে স্থানটি ছিল কবরস্থান। মানুষ মারা গেলে সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে চারিদিকে অনেক দুর্গন্ধযুক্ত মৃত দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়ে ছিল। তার সৎপিতা সোহাগকে শক্ত করে বেঁধে স্বশ্রাণে রেখে পেল গেল। ছেলেটি এতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল। সে তার সৎপিতাকে বলল, বাবা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমার খুব ভয় করছে। আমাকে এই স্বশ্রাণে ফেলে যেওনা। আমি তোমার সাথে বাড়িতে যাব। আমাকে একা এই কবরস্থানে রেখে যাবেন না। আমার খুব ভয় হচ্ছে বাবা। সোহাগ কাঁদতে লাগল। সোহাগ তার সৎপিতাকে বলল-বাবা এত নিষ্ঠুর তুমি। তুমিতো আমার বাবা তুমিই প্রভু। তোমার ছেলেকে ফেলে কোথায় যাবেন? তোমার সাথে আমাকে নিয়ে চলো না! ছেলেটি এতোই করে বলল তবুও তার সৎপিতার দয়া হল না এত নিষ্ঠুর পাষণ্ড হৃদয়। তার পরও তার সৎপিতা একা চলে গেল। ছেলেটি সেখানে বেঁধে রেখে চলে গেল। রাত যতই গভীর হতে লাগল সোহাগের ভয় হল যে তার সব শরীর ঘাম বের হয়ে সারা শরীর ভিজে গেল। যখন সে বাঘ-শিয়ালের শব্দ শুনতে পেল সে আরো বেশী ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে মনে করল এই নির্জন স্থানে সে একা। সেই স্থানে তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ নেই। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বারে বারে সে একটি আলো দেখতে পেল। সোহাগ দেখল এক সুদর্শন ব্যক্তি উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে তার দিকে আসতে লাগল। সে শুনতে পেল সেই সুদর্শন ব্যক্তি তাকে মধুর কণ্ঠে বলছেন-সোহাগ তুমি কেঁদোনা। আমি তো তোমার সাথে আছি। আমি তোমাকে এই জায়গা থেকে নিয়ে যাব। তখন হঠাৎ করে সোহাগের

গাণনাট্য অবস্থায় জেতবন বিহারে ভগবান বুদ্ধের সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় নাগোকে দেখতে পেল। ছেলেটি জেতবন বিহারে দেখে অভাগ হল। তখন সোহাগ নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ছেলেটিকে বিহারে এনে তাকে পোষাক পাল্টিয়ে দিয়ে কিছু খাওয়ার জন্য দিয়েছিল। খাওয়ার পর বুদ্ধ সোহাগকে সান্তনা দিলেন। সোহাগের সৎপিতা যখন বাড়ি ফিরল তখন সোহাগের মা জিজ্ঞেস করল তুমি একা কেন? আমার ছেলে কোথায়? তখন তার সৎপিতা বলতে লাগল-সেতো আমার আগেই বাড়ি এসেছিল। আমি তো মনে করেছি আমার খোঁকা ঘুমাচ্ছে। ছেলেটির মা সারা রাত তার ছেলের কথা ভাবতে লাগল। শুধু তার ছেলের চিন্তায় তার চোখে ঘুম আসে না। সে মনে মনে বলল-আমার স্বামী হয়তো কোথায় যেন ফেলে এসেছিল। কয়েক দিন পর সে ভাবল-ভগবান বুদ্ধ সর্বজ্ঞ। তিনি বর্তমান অতীত ভবিষ্যত সব বলে দিতে পারেন। তাই ভগবান বুদ্ধের কাছে যাব এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করব আমার ছেলে কোথায় আছে। তিনি হয়ত বলে দিতে পারবেন। এই ভেবে সে কাঁদতে কাঁদতে বিহারে উপস্থিত হল। বুদ্ধ তাকে ডেকে বললেন-তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার? ছেলেটির মা বলল, ভগবান আমার একমাত্র পুত্র গতকাল থেকে হারিয়ে গিয়েছে। আমার স্বামী ছেলেকে নিয়ে বের হয়েছিল। যখন সে বাড়ি ফিরে আসল তখন বলল-তোমার ছেলে কোথায় গেছে আমি কি ভাবে বলতে পারব। ভগবান বুদ্ধ তাঁর সব কথা শুনে বললেন-চিন্তা করো না, তোমার ছেলে ভাল ভাবে আছে এবং সে আমার কাছে আছে। এই বলে ভগবান বুদ্ধ সোহাগকে দেখালেন। সোহাগ এখন বালকরূপে নয়; সে এখন একজন প্রব্রজিত। মা তার পুত্র সোহাগকে দেখে খুব খুশী হলেন। বুদ্ধের ধর্মের কথা শুনে সোহাগের মা সেই ভগবানকে বন্দনা করে বুদ্ধের একজন অনুসারী হিসেবে হৃষ্ট মনে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সাধু-সাধু-সাধু

কঠিন চীবর দান

সংগ্রহেঃ

চারুবালা চাক্‌মা (কল্লোল মা)

মধ্যভিটা

বুদ্ধের সময় কালে মেণ্ডক নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। ধনঞ্জয় ছিলেন তাঁর পুত্র। ধনঞ্জয়ের স্ত্রীর নাম সুমনাদেবী। বিশাখা ছিলেন তাদের কন্যা। বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবন করে সাত বছর বয়সে বিশাখা স্রোতাপত্তি ফল করে ছিলেন। বিশাখা পাঁচশত সহচরী নিয়ে বুদ্ধকে সেবা যত্ন করতেন। বুদ্ধ তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি বিশাখাকে নানা উপদেশ দিতে থাকতেন। উপদেশ শুনে বিশাখা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আরো বেশী অনুরাগী হন। সে সময়ে শ্রাবস্তীতে মিগার নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। পুণ্যবর্ধন ছিলেন তাঁর পুত্র। পুণ্যবর্ধনের সাথে বিশাখার বিয়ে হয়। বিশাখার বাবা বিশাখাকে বহু দাস-দাসী গাভীর রথ মূল্যবান মনি-মুক্তা উপহার দিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠান। বিশাখা শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় তাঁর পিতা তাঁকে দশটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করেছিলেন। ঘরের আগুন বাইরে নিওনা, বাইরের আগুন ঘরে আনিওনা, যে দেয় তাকে দেবে, যে দেয় না তাকে দেবে না, যে দেয় বা না দেয় তাকে দেবে ইত্যাদি। মিগার সাত দিন ব্যাপী পুত্রের বিবাহ উৎসব পালন করেছিলেন। বিশাখা শ্বশুর উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের সেবা করতেন। এক দিন বিশাখাকে উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের সামনে নিয়ে যান। বিশাখার উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের দেখে লজ্জায় তাঁর বিরজিবোধ হয়। বিশাখার ভাব বুঝতে পেরে সন্ন্যাসীরা মিগারকে বললেন, এই রমণী গৌতমের শিষ্যা, একে ঘর থেকে বের দাও। না হয় তোমার সর্বনাশ হবে। এক দিন এক অর্হৎ ভিক্ষু মিগার বাড়িতে ভিক্ষার জন্য আসেন। বিশাখা ভিক্ষুকে বললেন, ভাঙে আপনি অন্য বাড়িতে যান। আমার শ্বশুর বাসি খাওয়ার খাচ্ছেন। এ কথা শুনে মিগার বিশাখার উপর অসুন্তুষ্ট হলেন এবং বাপের বাড়িতে চলে যেতে বললেন। এ কথা শুনে বিশাখাও উত্তরে বললেন, আমি ক্রীতদাসী নই, আমাকে ইচ্ছা করলে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার পিতা আট জন বিচারক লোক দিয়েছেন। তাঁদের বিচারে দোষী হলে আমি চলে যাবো। তাঁরা এলে বিশাখা সব কথা খুলে বললেন, কিন্তু বিশাখার কোন দোষ নেই। বিশাখা তাঁর বাবার অন্যান্য উপদেশ ও শ্বশুরকে ব্যাখ্যা করে বললেন। মিগারের

ডুল ভাস্কাতে বিশাখা তখন বললেন, আমি এখন বাপের বাড়িতে যেতে প্রস্তুত। মিগার নিজের ভুল স্বীকার করে বিশাখাকে থাকতে অনুরোধ করলেন, বিশাখা বললেন, আপনি উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের ভক্ত; আমি ত্রিরত্নের উপাসিকা। যদি আমাকে ইচ্ছা মত দান করতে এবং ধর্ম কথা শুনতে অনুমতি দেন, তাহলে আমি আপনার বাড়িতে থাকতে পারি। মিগার তাতে রাজি হলেন। কয়েকদিন পর বিশাখা বুদ্ধসহ ভিক্ষু সঙ্ঘকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিশাখা যাবতীয় দানীয় সামগ্রী সাজিয়ে তাঁর শ্বশুরকে ডাকলেন। বিশাখা খুব ভাল ভাবে দান পর্ব শেষ করলেন। তার পর তিনি শ্বশুরকে ধর্ম কথা শুনতে ডাকলেন। তখন মিগার মনে মনে ভাবলেন, এখন যদি না যায় তাহলে খুব অভদ্রতা দেখাবে। এই ভেবে যেতে চাইলে উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা বললেন, শ্রমণ গৌতমের ধর্ম কথা শুনলে পদারি আঁড়াল থেকে শুনবে। কারণ সন্ন্যাসীরা জানে বুদ্ধের মায়াবী ক্ষমতা আছে। মিগার তখন পদারি আঁড়ালে গিয়ে বসলেন। বুদ্ধ তখন বললেন, মিগার তুমি যবনিকার অন্তরালে প্রাচীর অন্তরালে যেখানে বস না কেন, আমার শব্দ সব জায়গায় ঘোষিত হবে। এই বলে মহাকারুনিক বুদ্ধ ধর্ম দেশনা শুরু করলেন। মিগার তা শুনে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। মিগার তখন বুদ্ধের সামনেই পুত্রবধূ বিশাখাকে বললেন, মা তুমি এত দিনে এই সন্তানকে উদ্ধার করলে। তখন থেকে বিশাখা মিগার মাতার নামে পরিচিত হন। বিশাখা পরিণত বয়সে তাঁর সমস্ত অলংকার বিক্রি করে একটি উদ্যান কিনে বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সেই বিহারের নাম পূর্বরাম। তিনি সেটি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদেরকে দান করেন। তিনি মহাউপাসিকা নামে খ্যাতি লাভ করেন। বিশাখার দশটি পুত্র সন্তান ও দশটি কন্যা সন্তান ছিল। মহাউপাসিকা বিশাখা একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর পুণ্যময় কাজের জন্য আজও তিনি বৌদ্ধদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় মহা পুণ্যবতী শালবতী দানবতী এবং মহালতা প্রসাধন লাভ কারীনি মিগার মাতা বিশাখা কর্তৃক ঐতিহ্যবাহী দানোত্তম কঠিন চীবর দান মহা সমারোহে ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাহিত্য পুণ্য ও সত্যের দ্বারা প্রতি বছর মহা কঠিন চীবর দান উৎসাহপন করা হয়। সূতা কাটা থেকে শুরু করে সূতা লাভা সূতা টিয়ানা বং করা ইত্যাদি, ইত্যাদির মাধ্যমে কাপড় বুনন করা হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ করণীয় কাজ শেষ করে সেই বুননের কাপড় দিয়ে টানার সেলাই করে

অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট দান করার নামই কঠিন চীবর দান। আশ্বিনী পূর্ণিমা পরবর্তী দিনে থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী এই উৎসব বিহারে বিহারে পালন করা হয়। তবে প্রতিটি বিহারে বছরে মাত্র একবার কঠিন চীবর দান করা যায়। অন্য কোন সময়ে এই দান করার নিয়ম নেই। আর যে বিহারে কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস পালন করে না, সেই বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হতে পারে না। বৌদ্ধ জগতে কঠিন চীবর দানকে দানোত্তম বলা হয়। কঠিন চীবর দানের ফল এতই বিপুল এবং পুণ্যময় যে, তা লেখা বা বর্ণনা করা যায় না। কঠিন চীবর দানের ফলে হীন কুলে জন্ম নিয়ে দুঃখ ভোগ করতে হয় না। জগতে যত রকম দান করা যায় তার মধ্যে কঠিন চীবর দানের ফল সবার উপরে। পর্বত প্রমাণ সোনা-রূপা মূল্যবান ধাতু দিয়ে চৈত্য নির্মাণ করলেও একখানা কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের এক ভাগ পুণ্য হয় না। এই সব মহা ফল জেনে সব মানুষ এই দান করুক, এইটি বুদ্ধ গণের উপদেশ। দান সব সময় প্রসন্ন চিত্তে করা উচিত কেননা, শ্রদ্ধা দানের ফল বৃদ্ধি করে এবং সুখ বয়ে আনে। এর প্রভাবে দাতা প্রতিরূপ দেশে জন্ম নিয়ে সৎসঙ্গ লাভ করে। জন্মজন্মান্তরে সৎ জীবন যাপনের সমর্থ হন। কুশল চিত্তে দানের ফলে সুফলের জন্য দাতা জন্মজন্মান্তরে সুশ্রী নিরোগী স্বাস্থ্যবান হয় এবং মাতা পিতা ও গুরু জেনে স্নেহভাজন হয়। তিনি সবার প্রিয় হয়ে সুখ ভোগ করে। এই লেখার প্রভাবে আমিও প্রার্থনা করিতেছি-জন্মে জন্মে যেন লেখকের মত প্রয়াস পেয়ে থাকি। আর নারীর জীবন আমার যেন আর পেতে না হয় এটাই আমার একান্ত প্রার্থনা। “ইদম্মে পুএৎএৎ পুরিসত্তভাব পটিলাভায় সংবত্তু”। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার এই প্রার্থনা করে এই লেখাতে যবনিকা টানলাম।

সাধু-সাধু-সাধু

-----○-----

ওগো ত্যাগী বনভাস্তে

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু

রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি

দুঃখময় এই ভব সংসার সীমারেখা ছেড়ে
চলে গেছ তুমি সে অনেক দূরে
জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুর বর্দার ছাড়িয়ে
আজি আছ তুমি কত তৃপ্তি মনে
রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা একটি চেয়ারে ।

বনভাস্তে তুমি কত মহান!
আজি এই পৃথিবীর তোমারী জয়গান
হাতছানি ডেকে যাচ্ছ মোদের তরে
অমৃতময় তোমার ধর্ম দেশনা করে
রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা একটি চেয়ারে ।

ধন পাতা নামে অরণ্য কুঠিরে
সাধনা করিলে বারটি বছর ধরে
অনাহারে অনিদ্রায় রোদ বৃষ্টি তোয়াক্কা করে
এসেছিলে ঘোর অন্ধকারে
জ্বহানের মশাল হাতে নিয়ে
বসে আছ রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা একটি চেয়ারে ।

বনভাস্তে তুমি কত সুন্দর!
সারা বিশ্ব আজ মৈত্রীর পরিপূর্ণ
তুমি সুখ তুমি আশা
সকল প্রাণীর প্রতি তোমার অফুরন্ত ভালবাসা ।

সাধু-সাধু-সাধু

নিজের প্রাণ নিজের কাছে যেমন প্রিয়, জীবগণেরও প্রিয়;
তাই সাধুরা নিজের মত করিয়া জীবে দয়া করেন ।

প্রভাতী আহ্বান

শ্রীমৎ সুবর্ণ ভিক্ষু

ঘিলাতলী সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার,

জুরাছড়ি

জাগো জাগো ওহে জাগো, সবে জাগো,
 ঘুম হতে জাগো সবে নিজ কাজে লাগো ।
 মনি জাগে, ঋষি জাগে, জাগে ধ্যানী গণ,
 জ্ঞান অনুসারী জাগে, লভে জ্ঞান ধন ।
 পাখি ডাকে, বৃক্ষ শাখা, আপন কুলায়,
 ডাকিল মোরগ ভোরে থেকো না হেলায় ।
 স্মর যত বুদ্ধ গণে স্মর বোধি জ্ঞানে,
 স্মর যত মুক্তগণে সম্যক প্রধানে ।
 বুদ্ধ গুণ, ধর্ম গুণ, সজ্জ গুণে,
 প্রশান্ত চিন্তে স্মর বসে একা মনে ।
 ত্রিলোক মাঝারে শুধু উদয় বিলয়,
 জন্ম-মৃত্যু ভবচক্রে দুঃখের আলয় ।
 মরিয়াছে মরিতেছে মরিবে সকল,
 অনুরূপ হবে মোর ইন্দ্রিয় বিকল ।
 উপবেশনে, দাঁড়ানে, গমনে, শয়নে,
 রাখ স্মৃতি সযতনে, স্মর ত্রিলক্ষণে ।
 ভব নদী পার হও ভাব বিদর্শনে,
 পাইবে অচ্যুত সুখ নির্বাণ গমণে ।

সাধু-সাধু-সাধু

কাজই ধর্ম

শ্রীমাণ সুদর্শন শ্রামণ
আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার
জুরাছড়ি

জীবন মোদের ক্ষণস্থায়ী
সময় যে খুব কম,
এক সময়ে শেষ হবে সব
ফুরিয়ে গেলে দম ।
সময় থাকতে কাজ কর ভাই
কাজই হলো ধর্ম
কাজের সময় কাজ করে যে
জীবন যুদ্ধে জয়ী হয় সে ।
কাজের মাঝে বাঁচতে হবে
কাজের মাঝে মরণ,
কাজের পরে থাকবে স্মৃতি করবে তোমায় স্মরণ ।

সাধু-সাধু-সাধু

হে বনভান্তে প্রণাম লও

শ্রীমাণ মৈত্রীসেন শ্রামণ
আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার
প্রণাম লও প্রণাম লও ওগো বনভান্তে,
তোমারী ছায়া দিয়ে আমারী প্রান্তে ।
বন জঙ্গল গভীর অরণ্যে ছিলে তুমি প্রসাদ ছাড়ি,
ঝর বৃষ্টি কাঁপুনিতে ত্যজিয়ে রয়েছে বাড়ি ।
রাত দিন কঠোর সাধনা করে তৃষ্ণা করেছ ক্ষয়,
দৃঢ় বীর্য ধারণ করে মারকে করেছ জয় ।
শীল সমাধি প্রজ্ঞা নিয়ে পরিপূর্ণতা ছিলে মহান সত্য নিয়ে ।
মানব কুলে জন্ম ছিলে লক্ষকোটি পারমী নিয়ে,
তোমারী মৈত্রী করুণা বাণী চারিদিকে মহিয়ান
তোমারী সত্যের বাণী সময়ের মাঝে থাকুক চির অম্লান ।

জগতে দুর্লভ মানুষ্য জীবন লাভ করে জন্ম নিয়েছি,
 কত যে ভাগ্যবান আমি আজই তোমাকে পেয়েছি ।
 কত যে অজান্তে না জেনে আমি পাপ করেছি,
 দুর্লভ প্রব্রজ্যা হয়ে ধন্য হয়েছি ।
 ওগো বনভান্তে শ্রদ্ধার সহিত আজ ও বন্দনা করি,
 জন্মজন্মান্তে যাহাতে পাপমুক্ত হতে পারি ।
 অনিত্য দুঃখ অনাত্ম জ্ঞানত্পাদন হল বিদর্শন,
 জানি না কি পুণ্য পারমী ছিল পেয়েছি তোমারী দর্শন ।
 শেষান্তে ও এই প্রার্থনা জানাই তোমারী প্রান্তে,
 সবাই যেন সুখী হয়, তোমারী ছায়াতে ।

সাধু-সাধু-সাধু

ক্ষমা করো মোরে

শ্রীমাণ শীলযান শ্রামণ

আমতলী ধর্মোদয় বন বিহার

জানি না কি এমন পুণ্য ফলে, বনভান্তে দর্শন পেয়েছি,
 তোমার দর্শন পেয়ে কত যে ধন্য হয়েছি ।
 ওগো বনভান্তে ক্ষমা করো যত পাপের অপরাধ,
 পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পাই যেন আর্য্য সত্য জ্ঞানের স্বাদ ।
 কত পাপ তৃষ্ণা নিয়ে এসেছি এই ভব সংসারে,
 জানি না কবে পাপ থেকে মুক্ত হবো তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে ।
 জানি না, না জেনে কত পাপ করে এসেছি,
 পাপের ক্ষমা চাই ওগো বনভান্তে কবিতায় যে লিখেছি
 ক্ষমা করে দাও মোরে এ পাপের অপরাধ,
 অচিরেই অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন করতে পারি করো মোরে আশীর্বাদ ।
 দৃঢ় বীর্য অক্ষুন্ন চিত্তে করিতে পারি বিদর্শন সাধনা
 লোভ তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে পাই যেন নির্বাণের ঠিকানা ।
 তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে আজ তুমি নির্বাণের স্রোতে,
 লোভ তৃষ্ণাতে জরিত আমি পঞ্চ মারেতে ।
 কঠোর সাধনা করে তুমি লোভ তৃষ্ণাকে ধ্বংস করেছ,
 তাই বলে আজ তুমি আমাদের মাঝে শ্রাবক বুদ্ধ হয়ে রয়েছ ।

ছোঁয়া ও আলোর পরশ

শ্যামল তালুকদার

কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি

কোন্ জনমের পুণ্য ফলে মানব জনম পেলে,
 জন্ম কি আর হয়রে সফল বৃথাই যদি গেলে?
 পলে পলে দিন যে ফুরোই টের পেলে না হয়!
 কত জনম এলোরে গেলো হিসাব যে তার নাই।
 জলের ধারা বয়রে কেন সব নদী তা জানে,
 স্রোতের টানে যায়রে জীবন এগোয় মরণ পাণে।
 চাওয়া যত অবিরত বাড়ায় মনের সাধ,
 চাওয়ার মাঝে নাই যে পাওয়া সকল সাধই বাঁধ।
 মনটা তোমার, তোমার কাছেই ইচ্ছা মতন ঘুরাও,
 ঘড়ির নাটায় তোমার হাতে মনের মতন উড়াও।
 ধন্য করো জীবন খানি ছোঁয়াও আলোর পরশ
 শূণ্য দিয়ে পূর্ণ করো তোমার মনের কলস।
 দুঃখ তব শূন্য হলে রইলে না আর আশা
 রইবে না আর এপার ওপার তোমার যাওয়া আসা ॥

সাধু-সাধু-সাধু

অবহেলা পঞ্চশীল

বিবেকানন্দ চাক্‌মা

সামিরা পাড়া

পঞ্চশীল তো গৃহীর ধর্ম, সব লোকে তা জানে
সত্যি কারের গৃহীর ধর্ম, কয় জনে তা জানে ।
প্রাণী হত্যা পঞ্চশীলে, ধর্ম মতে মানা,
প্রাণী হত্যা মহা পাপ, সব তো মোদের জানা ।
ব্যভিচার আর চুরির কথা, নিষেধ করা আছে,
এইগুলো সব করতে গিয়ে, খিলখিলিয়ে হাসে ।
মদ্য সহ যত জাতের, আছে মাদক নেশা,
মিথ্যা বলা ধর্ম বিরোধ, সব দুনিয়ার পেশা ।
শীল পালনে মহা ফল হয়, সব লোকে তা জানে,
পঞ্চশীলকে ফেলে দিয়ে, বিপদ কেন আনে?
বিপদ যখন আসবে কাছে, মনে মনে বলে,
বুদ্ধ ভাঙে বুদ্ধ ভাঙে, খানিক পর পর ডাকে ।
বিপদ যখন দূর দেশেতে, যদি চলে যায়,
ধর্ম আছে সব সময়ে কারোর হৃদিশ নাই ।

সাধু-সাধু-সাধু

আহ্বান

নির্মলকান্তি চাক্‌মা

বনযোগীছড়া

তুমি যদি একটু শান্তি চাও
এসো একটু স্বস্তি চাও
এসো ধর্মের পতাকা তলে
এরই ছায়ায় তুমি তা পাবে ।
তুমি যদি একটু সুখ চাও
যদি মানবিকতা চাও
যদি চাও শত্রু বন্ধু হোক
এসো সাম্যের পতাকা তলে ।

তুমি যদি জীবনকে সাজাতে চাও
যদি প্রবৃত্তির মোহকে ধ্বংস করতে চাও
এসো মানবতার পতাকা তলে
ধর্মের পতাকা তলে
বুদ্ধের পতাকা তলে ।

সাধু-সাধু-সাধু

চল সবে

মিস্ হিনিক্কো চাক্‌মা
চুমাচুমি

সুন্দর এই ভবে,
জন্ম নিয়াছি মানব কুলে
দুর্লভ জনমের হেতু পাইয়াছি
ভগবান বুদ্ধের পদতলে ।
নির্বানের অমৃত সুধা
পাইবার প্রত্যাশায়,
দান শীল ভাবনা
পালন করিব নির্দিধায় ।
বুদ্ধের পবিত্র ছায়ায় যদি দাঁড়ায়
কখন যে মন গলে যায়
বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের স্পর্শ যদি পায়
সব দুঃখ নিরবে হারায় ।
দুঃখে ভরা এই সংসারে
কে যে কখন আসে যায়
হতাশ কভু না হয়ে
চল সবে নির্বাণ শালায় ॥

সাধু-সাধু-সাধু

প্রিয় কঠিন চীবর

মিস্ জোসিনা চাক্‌মা

ঘিলাতলী

হে আমার প্রিয় কঠিন চীবর
 তুমি এসেছ বলে আজ আমাদের খুশীর দিন,
 তুমি এসেছ মানুষের মাঝে মিলনের দূত হয়ে ।
 তাইতো আজ আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে,
 সবাই তোমার সাথে একত্রিত হয়েছি এই পূন্যদানে ।
 আজ তুমি কত শত শতাব্দী পেরিয়ে
 এভাবে হয়তো থাকবে আরো অনন্তকাল ধরে ।
 অনিত্য ভব এই সংসারে, জন্ম নিয়েছি মানব কুলে,
 চলে যেতে হবে একদিন সব কিছু ছেড়ে ।
 তাই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা,
 যতদিন বেঁচে থাকি বার বার ফিরে এসো আমাদের মাঝে,
 মিলনের দূত হয়ে, কল্যাণের দূত হয়ে, পুণ্যের দূত হয়ে,
 এই প্রতীক্ষায় পথপাণে চেয়ে থাকবো ।
 এত দিন তোমায় শুধু রেখেছি ছোট্ট এ হৃদয়ের অন্তস্থলে
 সুযোগ পেয়ে আজ লিখে দিয়েছি
 স্মৃতির পাতায় সেই স্মরণিকাতে ।
 এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু রবে না
 শুধুই রবে তুমি চির অম্লান হয়ে ।
 সূতা কেটে বেইনবুনে বিশাখার প্রবর্তিত অনুসারে,
 আমতলী বিহারের তথা সমগ্র জুরাছড়ির এলাকাবাসীরা মিলে,
 আনন্দ মনে দান করবো শ্রদ্ধাভক্তি ভরে ।
 মহান দানোত্তম কঠিন চীবর দানের পুণ্য ফলে,
 আর্য পথে চলি যেন জন্মজন্মান্তরে ।
 এই প্রার্থনা করি মম অন্তরে
 লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা ধ্বংস হয়ে যাক নির্বাণের সাক্ষাতে ।

সাধু-সাধু-সাধু

হে জ্ঞানী
মিস্ রিতা চাক্‌মা
চকপতিঘাট

হে মহান জ্ঞানী বনভাঙে

তুমি যে মহান জ্ঞানের প্রদীপ
জ্বালিয়ে দিয়েছ মানুষের মাঝে
তা চির দিন থাকবে অম্লান ।

হে মহান জ্ঞানী বনভাঙে

তুমি যে অসীম জ্ঞানের অধিকারী
তোমারই জ্ঞানের তুলনা নেই!
তোমারই জ্ঞান, আমাদের দান করো
আমরা যেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারি ।

হে মহান জ্ঞানী বনভাঙে

আমাদের আশীর্বাদ করো,
আমরা যেন তোমারই পথটি
অনুসরণ করে তোমার মত
জ্ঞানী হতে পারি ।

অন্তিম তোমার মত আমরাও যেন

অবিদ্যা-তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে নির্বান সাগরে অবগাহন করতে পারি ।

সাধু-সাধু-সাধু ।

মহান কঠিন চীবর দান উপলক্ষে
বিন্দু চাক্‌মা
চকপতিঘাট

হে মহান কঠিন চীবরদান, বছরে এসগো তুমি একবার,
কি আমার আনন্দ লাগে, তাই বলিতে পারি না গো ।

কত মানুষ খুশীতে বরণ করে নেয় তোমায়,

হে মহান কঠিন চীবরদান ।

মানুষেরা বলে এইতো আসছে কঠিন চীবর দান,

এসগো সবাই মিলে করি সবাই এই মহান কঠিন চীবর দান ।

আজি মহান কঠিন চীবর দানে, ভাঙের যখন দেশনা দিবে,

একা মনে একা চিন্তে ভাঙে দেশনা শুনে,
 বাড়িতে গিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে ।
 হে মহান কঠিন চীবরদান,
 কবি তো আমি নই, কঠিন চীবর দানে তবু আমি আজি কবি ।
 তাইতো এই মহান কঠিন চীবরদানে,
 ছোট্ট একটি কবিতা লিখি ।
 হে মহান কঠিন চীবরদান, তুমি এসগো আলোর বিবরণে,
 আমরা আছি সেই আলো ছায়াতে ।
 তুমি যখন চলে যাও আমাদের ছেড়ে, আমরা তখন একা দিশাহারা ।
 নতুন করে এসগো আবার বছরে পরে,
 আমরা অপেক্ষায় রহিব নতুন করে সেজে ।

সাধু-সাধু- সাধু

রাজবন বিহার

মিস্ সংগীতা চাক্‌মা (চিজি)

চকপতিঘাট ।

রাঙ্গামাটির এক কোণে
 একটি পবিত্র স্থান আছে দেখার
 সবাই যে তাহা জানে
 রাজবন বিহার ।
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে
 এই বিহারে আছেন
 এসে ছিলেন তিনি মুক্তির পথ দেখাতে
 তিনি নির্বাণগামী, তিনি অন্তর্যামী,
 তিনি যে মহান ।
 আর্য্য পথ ধরে
 অরহত লাভ করেছেন বনভাস্তে
 ভাই বোন প্রিয় সব,
 এসো সবকিছু ত্যাগ করে
 হিংসা ছেড়ে, পাপ ছেড়ে,
 পুণ্য করি এক সাথে ।

মহা কঠিন চীবর দান

মিস্ রুমি চাক্‌মা

চকপতিঘাট ।

আজকে মহা কঠিন চীবর দান
এসো এসো সবাই বিহারে যাই
বিহারে গিয়ে ভাস্তের
ধর্ম দেশনা শুনে পবিত্র হই ।
তুলা থেকে সূতা তৈরী করে
সারা রাত্রি জেগে যে চীবর তৈরী করেছি
সে চীবর আজ আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা চিন্তে করবো দান
যে দানের কোন শেষ নেই,
সে দানই হল মহা কঠিন চীবর দান ।
সাধু-সাধু-সাধু ।

রাজবন বিহার

মিস্ রিমা চাক্‌মা (ইভা)

চকপতিঘাট

ফুলে ফুলে রঙে ভরা রাজ বন বিহার,
ফুলে ফলে গাছে ভরা সবুজ বনানী মনোহর ।
সারা দিবা-রাত্রি কত শত জন,
ধর্মপ্রাণ নরনারী করে আগমন ।
সাধনানন্দ বনভাস্তে গর্ব অহংকার,
তুমি মহান তুমি জ্ঞানী শ্রদ্ধার অলংকার ।
ধর্ম দেশনা শুনি কত জনে,
ধর্ম চক্ষু খুলে দিলে তুমি বনভাস্তে ।
সকাল বিকাল বন্দনা করি ত্রিরত্ন নাম ধরে,
বুদ্ধের নীতি মেনে চলি আর্য পথ ধরে ।

সাধু-সাধু-সাধু

আমাদের পণ

মিস্ কলি চাকমা

বামে চুমাচুমি

থাকবো না আর বন্ধনে,
 থাকবো না আর অজ্ঞানে ।
 থাকবো না আর এমন ঘরে
 অন্ধ যেথা ঘোর আধারে,
 মারের বার্ষন তুচ্ছ করি
 মুক্তির পথে যাত্রা করি ।
 দেখবো জগত ঘৃণা ভরে,
 লোভ মোহ ঘেষ ছিন্ন করে
 চলবো এবার সত্য পথে বুদ্ধ নীতি ধরে
 এই আমাদের কঠোর পণ
 সত্য পথে চলতে দেবো আমাদের এই মানব জীবন ।

সাধু-সাধু-সাধু

বন বিহার

মিস্ এবিকা চাকমা

শামুকছড়ি

সুন্দর একটি নাম আমতলী বন বিহার
 সেখানে নেই কোন অহংকার
 আছে শুধু শীল সমাধি প্রজ্ঞাসার
 দূর হয়ে যায় অবিদ্যা অন্ধকার ।
 বলা সহজ করা কঠিন অনেকে পাপে কাটায় দিন
 দুষ্কর্ম দুঃশীল চরিত্রহীন, সে হয় মারের পরাধীন ।
 ভাল-মন্দ না জানিয়া চলে যে জন
 মনে করিবে তাহার মত কেহ মূর্থ নন
 জীবন থাকিতে করে যে ধর্মাচরণ
 সার্থক হইবে তার মানব জীবন ।

গ্রন্থ পাঠে জানা যায় নরকে বাস করা বড় ভয়ঙ্কর
 নিজে নিজে উদ্ধার কারী অন্য কেহ নন ।
 দুর্লভ মানব জনম পেয়েছি যখন
 এমন সুযোগ হবে না আর কখন
 পণ্ডিত বলে মূর্থ ভাই!
 নির্বান ছাড়া উপায় নাই ।
 সাধু-সাধু-সাধু ।

খুশী মনের প্রার্থনা

মিস্ পারিকা চাক্‌মা

জুরাছড়ি সদর

প্রথমে বন্দনা করি শ্রদ্ধেয় বনভান্তেকে
 তার পরে বন্দনা করি তার শিষ্য সঙ্ঘকে ।
 ধন্য মোরা তোমায় শাসন পেয়ে বুদ্ধ ভগবান
 জগতে তোমার ছায়া পেয়েছি গেয়ে যাব জয় গান ।
 এসো সবে মোরা থাকি বনভান্তের ছায়ায়
 জন্ম জরা ব্যাধি দুঃখকে ক্ষয় করে নির্বাণ লাভের আশায় ।
 সত্য পথে মোরা চলি যেন বনভান্তের দেশনায়
 আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, প্রজ্ঞা লাভ হোক সর্বদা আমায় ।
 ভক্তি ভরে বুদ্ধের কাছে সদা আমি প্রার্থনা করি
 জন্ম জন্মান্তরে যেন সুখী হয়ে কুশলে রত থাকি ।
 জেগে উঠে এ প্রার্থনা ছোট্ট খুশী মনে মনে
 পূর্ণ হয় যেন ধরণীতল তোমার জয়গানে ।
 ধর্ম চক্ষু, ধর্ম জ্ঞান জন্মে জন্মে উদয় হোক আমায়
 অপায় পথে না যায় যেন বুদ্ধের ছায়ায় ।
 তোমার সাথে সত্য পথে মোরা অভিযান
 নির্বান পথে হতে পারি আমি মহীয়ান ।
 আমি যেন সুখী হই তোমার আশীষে
 তৃষ্ণা ধ্বংস করে যেন যেতে পারি নির্বাণের দেশ ।

সাধু-সাধু-সাধু

আশীর্বাদ

মিস্ জিতি চাক্‌মা

চকপতিঘাট

বুদ্ধ মন্দিরে গিয়েছি পবিত্র মনে
সুখী হয়ে থাকি যেন বুদ্ধের আশীর্বাদে
চলো সবে মিলে বনভান্তের ছায়াতে
দান করি তাকে চলি তার উপদেশে ।
সত্য পথে চলি সবে ভান্তে দেশনায়
শীল সমাধি প্রজ্ঞা নিয়ে নির্বাণে যায় ।
যখন যেখানে থাকি মনে মনে করি ভাবনা
ভান্তেকে পূজা করে দূর করি মনে কালিমা ।
সকল জীবের কল্যাণে এসেছেন বনভান্তে
দান শীল ভাবনার কথা মনে রাখি একাগ্রতা চিন্তে ।
এসো সবে তাই বনভান্তের ছায়ায়
দুঃখ মুক্তির অমৃত নির্বাণ লাভের আশায় ।
যত দিন বেঁচে থাকি পূজা করে যাবো বনভান্তেকে
মৃত্যুর পর যেতে পারি যেন শান্তির নির্বাণে ।
শ্রদ্ধা ভরে কবিতা শুভ কঠিন চীবর দানে
উৎসর্গিত হোক আমার বিমুক্তির দৃঢ় প্রত্যয়ে ।

সাধু-সাধু-সাধু

জ্ঞানের পূজারী বনভান্তে

মিসেস্ সেবিকা চাক্‌মা

চকপতিঘাট

তুমি মুক্ত, তুমি পরিশুদ্ধ, তুমি ধন্য
ধন্য তুমি হে বনভান্তে
তুমি যে সবার পূজারী ।
সব গুণে গুণী তুমি
তুমি যে গুণীমান ।
তুমি মহান, তুমি অসাধারণ
তুমি নির্ভীক, তুমি সত্যের সাধক

তুমি যে জ্ঞানের পূজারী ।
 দাও জ্ঞান, লও প্রণাম
 করুণা ভিক্ষা মাগি তব পদে
 হে আর্য্য মহান ।
 তোমারী জ্ঞানের বারিধায়
 মুছে যাক মোদের অজ্ঞান অন্ধকার ।
 সাধু-সাধু-সাধু ।

“তৃষ্ণা”

মিস্ সরঙ্গীনি চট্টোপধ্যায় (তন্দ্রা)

কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি ।

তৃষ্ণার ফলে জন্মেছি আজব কারাগারে,
 চারিদিকে শুধু অন্ধকার হয়ে পড়েছে,
 ধৈর্য্যের সীমা ধরে রাখতে পারছি নারে,
 তাই তৃষ্ণা ফেলে দিতে সবাইরে ।
 ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে তৃষ্ণাকে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে,
 নিজের চেষ্টায় যে আছে তৃষ্ণার প্রচেষ্টায় ।
 সহজে করিতে পারিবে তৃষ্ণার ধ্বংস ।
 বত্রিশ প্রকার অশুটিকে ঘৃণা চোখে যে দেখিবে,
 কোন কালে সেই জন নরকে না পরিবে ।
 অনন্ত কালে যাবে সে নির্বাণ ভুবনে ।
 দান, শীল, ভাবনা সব সময় জাগ্রত করিতে হইবে ।
 অনিত্য চঞ্চল দুঃখ অনাত্মময়
 ত্যাগ করিতে হইবে দুঃখের সাগর দুর্দশাময়
 সর্বস্থলে জীব যদি অবিদ্যা ত্যাগ করিতে পারে সর্বসঙ্কলন ।
 সহজে হেতু করিতে পারে প্রজ্ঞা আর্য্য ভুবন
 নির্বাণ অপূর্বরূপে জাগ্রত করিতে হইবে সবাইরে ।
 যে ব্যক্তি তৃষ্ণাকে এই জন্মে ত্যাগ করিতে পারিবে ।
 পরজন্মে সে জন নির্বাণ আবদ্ধনে থাকিতে পারিবে ।
 সর্বের সত্তা সুখিতা হোন্ত
 নির্বাণ যাওয়ার পথ খোলা থাকবে সবার জন্য ।

সাধু-সাধু-সাধু

দুঃখ মুক্তি ও মহান আৰ্যশ্রাবক বুদ্ধ (বনভাঙে)

মিস্ সুজিতা চাক্মা (শীলা)

পৃথিবীর দুঃখের লহরীতে আসিয়াছে যেই জন,
সেই দুঃখীরই দুঃখ নিবারণে রহিয়াছে এক পণ ।
সেই পণেরই অধিকারী একটি নির্বাণপদ পথ,
দুঃখ থেকে লইয়া যাবে সেই মুক্তির রথ ।
সেই রথ পথ পূর্ণতায় ভরিয়া কখন,
কর্মের গতিধারায় জড়িয়া যখন ।
জড়িয়া ভবের বন্ধনে মুক্ত করিতে নরেশ,
নরেশ এই ভূপতির চাই সামান্য পরেশ ।
সেই পরেশের যুগপতি মহান বুদ্ধ পুত্র,
তাহারই গুণে তাহারই জনে হইয়াছে সর্বত্র ।
সর্বত্রতায় মহান আৰ্য শ্রাবক বুদ্ধ,
তাহারই বীণার মূর্ছনায় করিぬ মুক্তির যুদ্ধ ।
যেই যুদ্ধের সফলতায় মন হইবে আশা মুক্তি,
ওগো ধন্য সর্বজ্ঞ মহান বুদ্ধ পুরুষ এটাইতো শ্রেষ্ঠ যুক্তি ।
যে যুক্তির ছায়ানলে রহিয়াছে বুদ্ধ বাণী,
ওই বাণীরই দানার্থে সকল জীব হইয়াছে মুক্তিকামী ।
আশীর্বাদান্তে চাই প্রভু মুক্তি লভিতে এ জীবন,
ধন্য যবে সফল হোক প্রার্থনায় করিয়া এ বচন
সাধু-সাধু-সাধু

দানোদ্রীয় সর্বজ্ঞা কঠিন চীবর দান

মিস্ উর্মি চাক্মা (টুনটুনি)

কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি

দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় কি আছে?
হাঁ হাঁ এজন্যই তো বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ঞ ধ্বনি বাজে
যে ধ্বনির কলতানে রয়েছে হাজার পুণ্য
সেই পুণ্যের বিচারে মানুষ হন ধন্য
ধন্য সেই সর্বোত্তম কঠিন চীবর দান

যেই খানেতে দান দিয়ে মানুষ পুণ্য ভাগ পান
 পুণ্যময় সর্বত্র সেই অনুষ্ঠান
 সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তো সকল নরনারী যান
 অগণিত মানুষ আসেন, আসেন স্বর্গবাসী দেবতাগণ
 সেই সকল প্রাণীর কলতানেই তো ভরে উঠে বিহার প্রাঙ্গন
 নামেতো কঠিন চীবর দান, আর কাজেও তো কঠিন চীবর দান
 সেই কঠিন নামটির সাফল্য তাই সবাই করতে চান ।

সাধু-সাধু-সাধু

ধর্মীয় গান

শ্রীমৎ জ্ঞানদীপ ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি ।

ভাবনা অর্থ মনর হাম

গম চিন্তা গড়ানা,

গম চিন্তা গরি গরি

চারিসত্য জ্ঞানান ভোগানা ।

নীরবে যারা ভাবনা গরন

চারিসত্য জ্ঞান আজাই,

দুগ্ ন থায় তারা মনত্

সত্য জ্ঞানান থাই ।

যেক্কে নাহি হোনজনর

মনত্ সত্য জ্ঞানান উদিবো,

যাদি যাদি দুগতুন তে

মুক্ত ওই পারিব ।

দুগতুন মুক্ত অবার চলে

পাপান ত্যাগ গড়ানা

পুণ্য হাম গরি গরি

জ্ঞানান মনত্ রাগানা । ঐ

এজ এজ আমিয়্য বেকুনে

চারিসত্য জ্ঞানান ভোগেই,

আন্ধার জাগা ফেলে যেনেই

আলোর পহরত্ যেই ।
 পুনঃ চানান পহর অয়
 উদিলে আন্ধার রেদোত্,
 আমা মনান অবিদ্যা তৃষ্ণা আন্ধারতুন
 জ্ঞানপহরে ফুদি উদোক ।
 চানে পহর গড়ে গাধা পিখিমি
 জ্ঞানে পহর গরে আমা মনান
 সেই পহরত্ মনচিত্তলোই
 নির্বাণ রেজ্যত্ আদানা । ঐ
 সাধু-সাধু-সাধু ।

গান

প্রজ্জাবোধি ভিক্ষু
 রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

এই এয়াইল আগাজর তলে তলে
 গাজ তারুমর চেরে চেরে,
 বনবিহারান ফুটি উত্তো
 বনভান্তেরে করত্ লোনেই ।

চের-অ কিত্তো ঘিরি আগে
 কাণ্ডেই পানিয়ান ডাগে ডাগে,
 বন বিহারত্ এলে বুক জুড়েই যায়
 বনভান্তেরে লাগত্ পেলে । ঐ

বনভান্তের জ্ঞানান চেরো কিত্তো
 বেল-অ ছদগ-অ ধক্যা ছিদি পজ্যে,
 সে ছদগ-অ পহরে পহরে
 এজ আমি বেগে নির্বাণ যেই । ঐ

সাধু-সাধু-সাধু

গান

শ্রীমাণ ধর্মরক্ষিত শ্রামণ

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি ।

মিলে মরত্ এজ বেগে বন বিহারত্,
 সত্যজ্ঞান ফুদেবাণ্ড্যেই আমা মনানত্ ।
 বেন্যা পত্যা হুজি মনে বন বিহারত্ যেই
 মন জুড়ে যায় হাঙ্কানে ভান্তেরে লাগত্ পেই ।
 বন ভান্তেরে দান গরিনেই ফিরি যেবং ঘরত্,
 এই দানর পুণ্যের ফলে দুগ্ ন এজোক জীবনত্ । ঐ
 পুণ্যই আনে মনত্ সুগ ন থাই দুগ্‌কানি,
 ভরি উদিব নৃ-অ আজালোই আমা মনানি ।
 ধোই ফেলেবং আদঙ হাজর ভান্তের জ্ঞান সাগরত্,
 ভান্তের নাঙান ছিদি পজ্যা গদা সংসারত্ । ঐ
 বন ভান্তের দেশনা শুনি গমেদালে থেই,
 পুণ্য গরি এগামনে নির্বাণ যেবাণ্ড্যেই ।
 নির্বাণ-অ জ্ঞান ওক জাদি আমা বেগর মনত্
 ও বাপ ভেইলক ও মা বোনলক এজ কিয়ঙত্ । ঐ
 সাধু-সাধু-সাধু

আমতলী বিহার স্মরণে

মিস্ সুচরিতা চাক্‌মা

শামুকছড়ি ।

আমতলী বন বিহার পুণ্য জাগা ফুল দোক্য দোল,
 আমতলী বিহারানত্ বুক্কো জুড়ে রঙল ।
 বেন্যাপত্যা ভান্তে দাগি ঘুমতুন জাগি,
 সূত্রপাঠ গড়ন তারা বেক প্রাণীত্যা় মঙ্গলত্যা় নির্ণি ।
 রেদোর পরে পহ্র অই পেগোর ডাগানায়,
 পুগোর বেলান উদে ইদু ভান্তে দাগির মৈত্রী ভাণনায় ।
 গম লাগে আমাতুন এই আমতুলি বিহারান,
 ইদু এলে চিৎ জুড়োয়, জুড়োয় মর পরান ।
 সাধু-সাধু-সাধু

গাই গাই মুক্তি অ-না

প্রসেনজিৎ চাক্‌মা

আমতলী পাড়া

তুই হন্না নিজেৰে চিনি ন-পারর
 এই সংসারত্ তরে বুঝি ন-পারর
 হন্না নিবো তরে মুক্তি গরিনেই
 তুই আগে আগে যেনেই ধ্যানত্ বুজিথেই
 হন্না যেব, হন্না থেব ইয়ান ন-ভাবিই
 যদি গরি এজ বেঙ্কুন নিৰ্বানত্ পথ ধরিই
 লারে লারে গুরি ফিরি এব মরণান
 সত্য ধর্ম ধরি থেনেই বাজিই-ল' নিৰ্বানান
 ঘুমোত্ থেয়ে- মানেই লগ্ উদো যদি গরি
 সত্যধর্ম পালেনেই বুদ্ধ চরণ লগি
 অতীত অয়ে বুদ্ধগুণ, বনভান্তেৰে
 সালাম জানেই বর মাগিলুঙ নিৰ্বান-দে মরে ॥

সাধু-সাধু-সাধু

যেই আমি ভাস্তে সিদু

গুরিমিলা চাক্‌মা (দুলাল মা)

নুয়া পাড়া

যেই বেগে আমি বনভাস্তে সিদু
 দোলে-দালে হাম গরিবোং ন-গরিনেই আলসি ।
 মানব-র এই জীংকানিত্ পুণ্য গরিনেই
 শ্রদ্ধা বিশ্বেস রাগেবং মনত্ বানিনেই ।
 আ নুয়া গরি জন্ম হলে এই সংসারত্
 পুণ্য হামত্ গম হামত্ ডুবি থেবং
 ন-অ-দ জীংকানিয়ান আন্দারত্ ।
 আগ জনমর পাপর ফলে মিলা অনেই জন্মোয়োং
 সিত্যায় বিলি এই জনমান ভারী মুই আগেয়োং ।
 মরিমারায় পরকালে ভব এই সংসারত্

ধার্মিক বাপ-মা কুলে জন্মোদুং মুই মরত্ ।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে লাগত্ পেনেই
 মুক্ত অদুং বেক দুগ্‌কানি না নাশ গরিনেই ।
 সাধু-সাধু-সাধু

বর মাগঙ

মিস্ সঙ্ঘিতা চাক্‌মা
 চকপতিঘাট ।

আতজুর গরি জুঁ জানাঙ মুই তরে,
 গম মনে হোজলী গরঙ জেন দে মরে ।
 বার বজর ধ্যান গরি যে ফল পেয়োছ্‌ তুই,
 আদ জুর গড়ি তত্তুন এচ্ছে সে ফলান চাঙর মুই ।
 এচ্ছেজ তুই আমা সিদু থেবে জনমান,
 বর মাগঙ ত' সিদু মুই হলিনেই পরানান ।
 নির্বানত্ সুগ আঘে আমারে বুঝেছ্‌ তুই,
 সে জাগানত্ যেবার চাঙ ত' সমারে মুই ।
 মানব জনম দুর্লভ জন্ম পেয়েই এচ্ছে আমি,
 সে জনমান দোল অবাঙেই তরে আমি মানি ।
 সুগ দুগোর এই পিখিমীত্ তরে আমি পেয়েই,
 জনম দুগোত্ ন-অ থেবাঙেই তরে আমি থোগেই ।
 জেনর সাগর দোয়ের সাগর তরে মানিবোঙ,
 জনম জনম বেগে মিলি তরে ভাবিবোঙ ।
 আগছ্‌ তুই থেবে তুই আমা দোল মনত্,
 বেগে মিলি ত' সমারে যেবঙ নির্বানত্ ॥

সাধু-সাধু-সাধু

ত্যাগী বনভাস্তে
মিস্ রূপনা চাক্‌মা
শামুকছড়ি

জ্ঞানীবান ত্যাগীবান তে রাজ বন বিহারত,
বুদ্ধ পুত্র বনভাস্তে ইক্কুনে অয়ে অরহত ।
বনভাস্তের কধা শুনিতেই বেঙ্কুনে মানিবং,
যেই পাপ-পানি কেয়াত্‌ আগে হাদেবার চেষ্ঠা গড়িবং
পাপ-পানি আমি হাদেই ন-পারিলে, বুদ্ধ সিদু যেবং
আদু পারি আদ জুর গড়ি বুদ্ধোর মুজুঙোত্‌ বুজিবং
মনে মনে হোই দিবো বুদ্ধ, তোমা পাপ-পানি হাদেই দোং
পাপ ন-গড়ি আর শীল পালেবং বুদ্ধ নীতিয়ে চলিবং
পরকালে যেন্‌ হামাক্‌য়া আমি আৰ্য মিত্র বুদ্ধরে লাগত্‌ পেবং
হাররে হিয়েই হিংসা ন-গড়িবং পঞ্চশীল পালেবং
এগা মনে এগা চিত্তে আমি বুদ্ধরে পূজিবং ।
বেন্যা বেল্যা বাত্তি জ্বালেবং বুদ্ধ আসনত্‌
মরন কালে যেনে আমার দুগ ন-অয় কেয়ানত্‌
আজা গরং মা বাপ ভেই বোনুন শীল পালেবা
তোমা সিদু এই আজা রাগেই শেষ গরঙর
বুদ্ধরে জানেই বন্দনা ।

বর মাগঙর
চন্দ্রবসু চাক্‌মা
শুকনাছড়ি,
বনযোগিছড়া

পল্লেন্দি বন্দনা জানাং ওগো বুদ্ধ তরে,
বন্দনা গরং তুই বানেয়ে ভিক্ষু সংঘরে ।
মাতা পিতা আচারিয়া গুরু স্মরণ গরঙর,
দশ হিত্যান্দি দেবগণ তোমারে স্মরণ গরঙর ।
অবুঝ মানেই মুই ন-জানঙ বুদ্ধ ধর্ম সার,
চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ নয়-হারা জানিবার ।

চারি আর্য্যসত্য আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরে পুজি ন-জানঙর মুই,
 হিঙিরি হোলেম ও ভগবান বুদ্ধ মানেই মুই ।
 ফুল তুম্বাঝ এক হিত্যান্দি বানা বেই যাই,
 শীল তুম্বাঝ লক্ষ যোজন দুরত্ ছড়ি যাই ।
 দামি হীরা, চন্দনদোই গাদিলে ন-যায় পাপ ক্ষয়,
 শীল সত্যলোই থেলে যায় পাপ ক্ষয় ।
 ত-শাসন পাজ আজার বজর দিযেয়োজ ভগবান,
 জন্মেনেই ত-শাসনত্ ধন্য এই জীবননান ।
 বুদ্ধ শূন্য কল্পত্ ন-জন্মেদুং মুই,
 জ্ঞেনী অনেই বুদ্ধ শিয্য অদুং বুদ্ধ হালত্ মুই ।
 মহাঋদ্ধি মার বিজয়ী অরহত্ হে উপগুণ্ড তুই,
 ত-ধক্যা মুইও ত্যাজি অদুং এই বর চাঙর মুই ।
 এই বর চেনেই ভগবান অরহত্ বেগরে সালাম,
 অবুঝ মানেই মুই, পুরেইদো মর প্রার্থনা-আন ॥

সাধু-সাধু-সাধু

অরহত্ পূজনীয় বনভান্তে

মিস মনীষা চাক্‌মা

বনযোগীছড়া

ও প্রভূ বনভান্তে যেন্ তুই ভগবান
 তুই যেন্ তিন ভূমিত্ পূর্ণিমার চান্ ।
 অবুঝ এজ মুই আগঙ আঙচ্যা আন্দারত্
 জ্ঞেন আলো দে- ভান্তে ম-মনানত্ ।
 ভিক্ষুর মধ্যে সারিপুত্র এল বেজ জ্ঞেনী
 মহা ত্যাগী সেধক্যা তুই আর মহাজ্ঞেনী ।
 মিথ্যা দৃষ্টি ত্যাগ গরি অয়োছ প্রজ্ঞাবান
 বারো বজর সাধনা গুরি পেয়োজ তুই নির্ণানান ।
 ন-নেয়ে গরি বু-উ জানাঙ ও অরহত্ তরে
 ত-ধর্মত্ গিরেত্ থেদুঙ ন-যেদুঙ বারে ।

ও আর্য্য ও সাধক তুইও ভাগ্যবান
 লাগত্ পেলুন তরে যেন্ বুদ্ধর সান ।
 একত্রিশ ভূমিত্ ও ভাঙ্তে তরে বেগে পুজোন
 তরে পুজিবার মুই ভাঙ্তে প্রার্থনা মাগঙ ।
 জন্মে জন্মে ন-বুঝিনেই পাপ গচ্যেঙ মুই
 তরে পজি পাপ ক্ষয় গরি পারঙ যেন্ মুই ।
 জনম জনম ত-ধক্যা আর্য্য সাধক লাগত্ পেদুঙ মুই
 আওজ গরি বন্দনা জানেই এ বর পেদুঙ মুই ॥

সাধু-সাধু-সাধু

চাক্মা কধায় ফুল পুজা

সংগ্রহেঃ মিস্ রমা চাক্মা

চৌধুরী পাড়া

নানা বাবন্ত্যা ফুলুন্দোই পুজঙর বুদ্ধরে
 আদুপারি আদজুর গরি ঝু-ঝুউ জানাং তরে ।
 আদজর গরি হোই যাঙর তরে ভগবান
 ঠিগি থেদ ফুলো চান্যা মর এই জনমান ।
 ন-জানঙর ভক্তি গরি অহবাল্যা মুই ।
 অজ্ঞান মিলা মুই ভগবান আন্য়োং ফুলুন তুলি
 পুজিবাত্যায় আন্য়োং ত-ইদু হুজি মন গরি ।
 হি অপরাধ গচ্যং বুদ্ধ ঝু-ঝুউ গরং তরে
 দয়ে গরি তুই ভগবান হেমা গর মরে ।
 আগ জনম অজ্ঞান অনেই হি পাপ গজ্যং
 সিত্যায় বিলি এই মিলা মুই জন্মোয়োং ।
 আশীর্বাদ মাগঙর বুদ্ধ ত-ঠেঙত্ পড়ি
 আঝা পুরন গরি-দে বুদ্ধ এই ফুলুন লোনেই ।
 ছ'গান জ্ঞান লাভ গরিনেই জন্মোদুং সংসারত্
 মিলা জনম ফেলে দিনেই জন্মোদুং মুই মরত্ ।
 জনমর এই জ্ঞানান মুই লাভ গরিদুং,
 আগ জনমত্ হি এলুং মুই হোই পারিদুং ।

এই জ্ঞানান মুই লাভ গরিদুং,
 ত্রিভুবনত্ রিনি চেলে বেঙ্কানী মুই দেগিদুং ।
 দিব্যকর্ণ মুই লাভ গরিদুং,
 ত্রিভুবনত্ হি হধা হন্ মুই শুনিদুং ।
 এই জ্ঞানান মুই লাভ গরিদুং,
 প্রাণীরগুণোর মনর হধা মুই হোই পারিদুং ।
 এই জ্ঞানান মুই লাভ গরিদুং,
 হমলে পরিম মরিম্ মুই হোই পারিদুং ।
 ঋদ্ধি জ্ঞানান মুই লাভ গরিদুং,
 মরণর পর হুধু যাঙ সিয়ান হোই পারিদুং ।
 হজ্জহজরা মর মনান হোন দিন ন-থেদ,
 এই ফুলুনো ধক্যান গরি নিত্য হুজি থেদ ।
 এই বরানি মাগঙর তত্ত্বন ভগবান,
 গজেন বুদ্ধ গুজি লনা এই তুম্বাজফুল ।
 এই ফুলুনো ধক্যান গরি তরে মুই কোচপেদুং,
 মরিমারাই দোলে গরি নির্বাণ মুই যেদুং ।

সাধু-সাধু-সাধু

আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের নামঃ-

- ১। আহ্বায়ক- বাবু নিরেন্দ্রলাল কারবারী
- ২। আহ্বায়ক- বাবু দীপায়ন দেওয়ান
- ৩। আহ্বায়ক- বাবু কালি কুমার চাকমা।

আমতলী ধর্মোদয় বন বিহারের কার্যকরী কমিটির সদস্য-

সদস্যদের নামঃ-

- ১। সভাপতি- বাবু জ্ঞান বিহারী চাকমা
- ২। সহসভাপতি-বাবু রমলেন্দ্র লাল চাকমা
- ৩। সাধারণ সম্পাদক- বাবু ভুবনানন্দ চাকমা।
- ৪। সহ সাধারণ সম্পাদক- বাবু কেতন চাকমা
- ৫। সহ সাধারণ সম্পাদক-বাবু তরুন আলো চাকমা
- ৬। কোষাদক্ষ-বাবু মতিলাল চাকমা
- ৭। সদস্য-বাবু নিবারণ মেস্বার
- ৮। সদস্য-বাবু-লাল মোহন কারবারী
- ৯। সদস্য-বাবু দয়াল চন্দ্র কারবারী
- ১০। সদস্য-বাবু মিলন কুমার কারবারী
- ১১। সদস্য-বাবু যুগেন্দ্রলাল চাকমা
- ১২। সদস্য-বাবু স্নেহ চাকমা
- ১৩। সদস্য-হৃদয় রঞ্জন চাকমা
- ১৪। সদস্য-বাবু রনঞ্জয় মেস্বার
- ১৫। সদস্য-বাবু নির্মলেন্দু চাকমা
- ১৬। সদস্য-বাবু নিগিরেশ্বর চাকমা
- ১৭। সদস্য- বাবু দীপ্তি শেখর চাকমা
- ১৮। সদস্য-বাবু অশ্বিনী কুমার চাকমা
- ১৯। সদস্য-বাবু জ্যোৎস্না বিকাশ চাকমা
- ২০। সদস্য-বাবু অনির বিন্দু চাকমা
- ২১। সদস্য-বাবু শান্তিময় চাকমা
- ২২। সদস্য-বাবু অনিল চাকমা
- ২৩। সদস্য-বাবু কামিনীনন্দ চাকমা
- ২৪। সদস্য-বাবু পিন্টু চাকমা
- ২৫। সদস্য-মিসেস্ জ্যোৎস্না তালুকদার
- ২৬। সদস্য-মিসেস্ মিতা চাকমা
- ২৭। সদস্য-মিসেস্ অর্চনা চাকমা
- ২৮। সদস্য-বাবু ঈশানচন্দ্র চাকমা
- ২৯। সদস্য-বাবু অমৃতলাল চাকমা

সমাপ্ত